পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারি ২০১০ — ডিসেম্বর ২০১০

এই নববর্ষ আমাদের কাছে ক্রোধের বর্ষ,

নতুন বছর ২০১১ এল যখন তখন ডা: বিনায়ক সেন রায়পুর জেলের নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন বেশ ক'দিন হল। দেশদ্রোহিতা আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন প্রখ্যাত এই চিকিৎসক ও মানবাধিকার কর্মী। এই কারাদণ্ডের রায় দিয়েছেন ছত্তিশগড়ের এক স্থানীয় আদালতের বিচারপতি বিচারের নামে এই প্রহসনের পর নতুন বছরে এসে প্রথা অনুযায়ী 'শুভ নববর্ষ' বলে শুভেচ্ছা জানান সম্ভব হচ্ছে না কারোকেই। বরং মনে হচ্ছে এই বছরকে 'ক্রোধের বছর' বলে চিহ্নিত করি এবং এই বলেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্ভাষণ চালাই যতদিন না জেল থেকে মুক্ত হচ্ছেন ডা: বিনায়ক সেন, খারিজ হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ, শাস্তি হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের, এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে তাঁর স্বজনদের যাঁরা এতদিন ধরে হয়রানি শিকার হয়েছেন ও হচ্ছেন।

মাওবাদী আন্দোলনের অজুহাতে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর ছত্তিশগড় সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনার জন্য আমাদের এই ক্রোধ। ডা: সেন ও তাঁর মত যাঁরাই আদিবাসী জনজাতির স্বার্থে কথা বলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সরকারের ঘৃণ্য চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের এই ক্রোধ। আমাদের ক্রোধ পুলিশের সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে খুন করার জন্য এবং সরকারের বড় বড় কোম্পানীর স্বার্থে সাধারণ মানুষকে ভিটে-মাটিচ্যুত করার জন্য।

আমাদের এই ক্রোধ মাওবাদী নেতার চিঠি বহনের মত তুচ্ছ অভিযোগ তুলে ডা: সেনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মত ভয়ঙ্কর সাজা দেওয়ার জন্য। আমাদের ক্রোধ সাজানো প্রমাণের ভিত্তিতে এবং যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর কথায় কান না দিয়ে বিচারের নামে এই প্রহসনের জন্য।

এই রায় এমনই এলোমেলো ও খাপছাড়াভাবে লেখা যে দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিচারক নয়, লিখেছেন ছত্তিশগড়ের একজন পুলিশ, -এজন্যও আমাদের এই ক্রোধ। আমাদের ক্রোধ এজন্য যে এই রায় দেওয়া হয়েছে ঠিক খ্রিষ্টমাসের আগে যখন হাইকোর্টে ছুটি চলছে, যাতে অভিযুক্তের পক্ষ থেকে দ্রুত জামিনের আবেদন করা না যায়।

আমাদের ক্রোধ মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ডা: সেনকে কারারুদ্ধ করে, তাকে বিচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে আটকে রেখে তার সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য। আমাদের যে বিচার ব্যবস্থা, যার অপব্যবহার করে পুলিশ যেভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে যেমন খুশি আটক করছে, জেল খাটাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও। 'বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রে' গণতান্ত্রিক আদর্শকে এভাবে খোলাখুলি হত্যা করার জন্য আমাদের এই ক্রোধ।

আমাদের ক্রোধ এই জন্যও যে 'দেশদ্রোহিতা'র অভিযোগ আনা হয়েছে এমন একজন মানুষের বিরুদ্ধে যাঁর জীবন নিবেদিত সাধারণ মানুষের সেবায়, আর সেখানে খুনি লুঠেরারা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু নয়, তারা সরকারের নানান উচ্চ পদে আসীন। আমাদের ক্রোধ আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ক্ষমতাসীনরা যদি বলেন ডা: বিনায়ক সেন 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অভিযোগে অভিযুক্ত, তা'হলে আমরাও বলব: 'হ্যাঁ, আমরাও তাই'।

-সত্য সাগর

সূত্র: কাউন্টারকারেন্টস ডট অর্গ/সাগর০২০১১১ ডট এইচটিএম

বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১-৪ ☐ জানুয়ারি- ২০১০-ডিসেম্বর-২০১০

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১-৪

জানুয়ারি-২০১০-ডিসেম্বর ২০১০

☐

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী

পি ২৫২ লেক টাউন, ব্লক এ

কলকাতা ৭০০ ০৮৯

☐

মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা

☐

Vigyan O Vigyankarmi
Rn. No. 34929/79

☐

Vol. XXXII No. 1-4
January 2010-December 2010

☐

Communication :
C/O Avijit Lahiri
P252 Lake Town, Block A
Kolkata 700 089

☐

e-mail : bob_s[illegible]f@yahoo.co.in
Website : www.scienceandsocietyinbob.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা

এক বছর পরেই আবার বেরোচ্ছে বিওবি। স্বতস্ফূর্ত ভাবে এটাই সম্ভব হল। তাই এটাই বাস্তব এবং সুন্দর। বিওবি'র ভাবনার কেন্দ্রে আছে বিজ্ঞান ও সমাজ, তাদের সম্পর্ক। তাই তাগিদটা থাকে দুদিকেই। যখন 'ভিতর' ও 'বাহির' -থেকে তাগিদ চাগিয়ে ওঠে তখনই বেরোতে পারে বিওবি।

সমাজে বিজ্ঞানের সর্বোত্তম কল্যাণময় প্রভাব বা প্রয়োগ শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতি বা অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, হয়নি কোনদিনও। এবং তা স্থান-কাল-ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়। একই বিজ্ঞান ফ্রান্সে যেভাবে কাজ করছে, প্রযুক্ত হচ্ছে, কলম্বিয়ায় সেভাবে হচ্ছে না, ইথিওপিয়াতে আরও অন্যরকম। ... এবং ভারতে - অন্যরকম শুধু নয়, জটিল ও কঠিন।

ভারতে বোধহয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ই সেই বিজ্ঞানী যিনি আজীবন লিখেছেন বলেছেন করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে বিজ্ঞানকে দেশের, মানুষের, পরিবেশের ও সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সামনের দিকে এগোতে হয়। স্বাধীন ভারতে ক্রমশ বেশী বেশী করে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি জীবনে বিজ্ঞানের গুরুত্ব প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য - আমাদের দিশায় প্রবল থেকে প্রবলতর গলদ - কারণ প্রফুল্লচন্দ্রদের আমরা ভুলে গেছি, 'দেশ' সম্পর্কে আমাদের ধারণা গুলিয়ে গেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের এই ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের নতুন করে দিশার সন্ধান করা দরকার।

যতই আমরা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে এগোবার চেষ্টা করছি ততই বেশী করে সমস্যার গভীরে নিমজ্জিত হচ্ছি, তা সে পানীয় জলই হোক বা অসুস্থের চিকিৎসা,এমনকি দুমুঠো ভাত বা একটুকরো বেগুনও এখন এর আওতার বাইরে নয়। জিন-পরিবর্তিত খাদ্য শস্য ভারতে কিভাবে কতটা প্রবর্তন করা দরকার তার দিশা পেতে প্রফুল্লচন্দ্রদের স্মরণে রাখাটা জরুরী, জরুরী লক্ষ্য স্থির করা - কি আমরা চাই? ব্যবসার বাণিজ্যের প্রসার ও তার সূত্রে জি ডি পি বাড়ানো নাকি দেশের মানুষ, পরিবেশ সংস্কৃতির সুস্বাস্থ্য।

এসবই এখন প্রাসঙ্গিক এবং এইসব নিয়েই বি-ও-বি আত্মপ্রকাশের চেষ্টা চলছিল। প্রেসের কাজকম এগোচ্ছিল, এমনই সময়ে অল্প ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা আমাদের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে গেল। প্রথমটি ঘটল ডিসেম্বর'১০ এর শেষে, ঠিক বড়দিনের আগে। প্রখ্যাত চিকিৎসক, মানবাধিকার কর্মী এবং প্রান্তিক মানুষদের সেবায় আত্মনিবেদিত ডাঃ বিনায়ক সেন দেশদ্রোহিতার অপরাধে ছত্রিশগড়ের আদালতে আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ও ধৃত। আর দ্বিতীয়টি ঘটল তার দুসপ্তাহের মাথায় নতুন বছরে ৭ জানুয়ারী আমাদের এই রাজ্যের জঙ্গলমহলে, লালগড়ে নেতাই নামক অখ্যাত এক গ্রামে। অজানা অচেনা সশস্ত্র দুস্কৃতিরা গুলি চালিয়ে খুন করল ৭ জন গ্রামবাসীকে - মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে, অনেকে আহত এবং তাদের মধ্যেও কয়েকজনের অবস্থা সংকটজনক। ....দুটি ঘটনাই আপতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক এবং যথারীতি রাজনৈতিক দলবাজিও শুরু হয়ে গেছে। ...কিন্তু এই ঘটনাদুটি কি বি-ও-বি'র এক্তিয়ারে পড়ে? পড়ে না কি? বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ, পরিবেশ ধ্বংস, অনুন্নয়ন, সন্ত্রাস এসবও কি বিজ্ঞানের নামেই হয় না? এসবেও কি ভীতিপ্রদর্শন, জবরদস্তি, হিংসা, সন্ত্রাস, বন্দুক দেখিয়ে জনমত দাবিয়ে রাখা - এসবই প্রযুক্ত হয় না? আমাদের মনে হয়, বিশেষ জ্ঞানী বা রাজনীতি-বিজ্ঞানী ছাড়া অন্য যে কেউ সাধারণবুদ্ধিতে বিজ্ঞান ও রাজনীতির এই গভীর দুঃসম্পর্ক স্পষ্টই দেখতে পান।

তবে এই দুটি মর্মান্তিক, লজ্জানক এবং ক্রোধউদ্রেককারী ঘটনার দু-একটি ভালো দিকও ফুটে উঠেছে। বলা যায়, নিজেদের নির্যাতন ও মৃত্যুর বিনিময়ে ডাঃ সেন এবং নেতাই গ্রামের অতি সাধারণ মানুষেরা দেশবাসীর জন্য অশেষ উপকারের বন্ধ দরজায় প্রবল ধাক্কা দিলেন।

ডাঃ সেনের 'বিচার' দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই লজ্জায় ফেলেছে। এমন যে কংগ্রেসদল বিচার ব্যবস্থার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে থাকে তাদেরও কেউ কেউ এই বিচার ও রায়ের নিন্দা করেছে। অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থার উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা স্বীকৃতি পেয়ে গেল। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে এটা। আরও একটি লক্ষ্যনীয় দিক এই যে মাওবাদী বা তেমন জঙ্গী আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়ালে কি পরিণতি হতে পারে, তা দেখিয়ে দেবার তাড়নায় যারা ডাঃ সেনকে শাস্তি দিল, তারাও বুঝতে পারলো যে এই স্ট্র্যাটেজি ব্যাক ফায়ারও করতে পারে। উগ্রপন্থী দমনে যে কোন ব্যবস্থার পক্ষে যারা এতদিন সওয়াল করেছে, তাদেরও অনেককে আজ এই বাড়াবাড়ির নিন্দা করতে হচ্ছে।

উগ্ররাজনীতিতে বিশ্বাসীরা সাধারণত রাষ্ট্রের এই ধরণের হিংস্রতায় উল্লসিত হন, প্রচারের সুযোগ পান। কিন্তু তাদেরও জেনে

রাখা দরকার যে নিছক কৌশলগত কারণের জন্য হলেও যে সাধারণ মানুষের সমর্থন তারা প্রত্যাশা করেন, সেই সাধারণ মানুষই কিন্তু তেমন প্রচেষ্টায় বিমুখ হয়ে উঠতে পারেন।

নেতাই গ্রামের হত্যাকাণ্ডও তেমনি একটা তুলামূলকভাবে শুভ ইঙ্গিত বয়ে এনেছে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র অত্যাচারী বাহিনী থাকার 'গোপন কথাটি' হঠাৎ করে হাটের মাঝে উন্মুক্ত হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গবাসীরা রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষমতাসীনরা রাজ্যবাসীর প্রতিবাদ আর্তনাদে কান না দেবার যে কঠোর কালাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, আজ রাজ্যবাসীও তাদের কোন ব্যাখ্যাই শোনার ধৈর্য দেখাতে যেন রাজী নন, তাঁদের কোন কথাতেই আজ আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না মানুষ। এই সরকারের কোন ক্রেডিবিলিটিই আর নেই রাজ্যবাসীর কাছে। ঘুরে দাঁড়ানোর মরীয়া প্রচেষ্টা 'মরিয়াই' গেল বুঝি। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের প্রতি সামান্য আস্থা থাকলেও যেসব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার ছিল, শাসকরা তার কোনটাই করেনি, কাজেই নিজে থেকে পদত্যাগ করে নতুন করে মানুষের রায় গ্রহণ করার মত গণতান্ত্রিক উদারতা তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক দুর্নাম ঘোচানোর কোন রাস্তাই তাঁরা রাখলেন না।

এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকর্মীদেরও যে দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে তা দেখিয়ে গিয়েছিলেন সেই প্রফুল্লচন্দ্রই। প্রায় ৯০ বছর আগে। বিওবি নতুন কিছুই করছেনা।

বিধিবদ্ধ ঘোষণা

পত্রিকার নাম	:	বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রকাশনার ভাষা	:	বাংলা ও ইংরেজি
প্রকাশনার স্থান	:	পি-২৫২ লেক টাউন ব্লক-এ কলকাতা ৭০০ ০৮৯
প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশকের নাম	:	রবীন মজুমদার
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ ৯২ এ. পি. সি. রোড কলকাতা ৭০০ ০০৯
মুদ্রকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
সম্পাদকের নাম, জাতি ঠিকানা	:	ঐ
প্রেসের নাম ও ঠিকানা	:	ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে শান্তি আর্ট প্রিন্টার্স কলকাতা ৭০০ ০১২

আমি, শ্রী রবীন মজুমদার, ঘোষণা করছি যে, উপরি-উক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ রবীন মজুমদার
প্রকাশক, *বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী*

ধনী অবস্থায় মৃত্যু অগৌরবের

— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সুখী জীবনের জন্য ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই

— রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর রসদ সকলের প্রয়োজন মেটাতে পারে কিন্তু
লোভ মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়

— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

দারিদ্র ও সমাজতন্ত্র সমার্থক নয়, বড়লোক হওয়া গৌরবজনক

— দেং জিয়াও পিং

১৫০ তম জন্মবর্ষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ এক বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত দিশারী

রবীন মজুমদার

এক ।। তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি

এই ২০১০ খ্রীষ্টাব্দ - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৫০ তম জন্মবর্ষ, এবং রবীন্দ্রনাথেরও। এই শিরোনামে কবিগুরুর গানের পংক্তিটি যদিও উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তবুও এখানে আমি শুধু আচার্য রায়কে নিয়েই আলোচনা করব।

অনেকের হয়তো ক্ষোভ ও রাগ হবে, বলবেন যে এটা নিছক নিন্দা, অপবাদ। আচার্য রায়কে আমরা মোটেই ভুলিনি। দেখুননা - চারপাশে তার কত নিদর্শন। তাঁর কর্ম ও জীবনের শেষ সাতাশ বছর কেটেছিল যে বিজ্ঞান কলেজে, তার পাশের রাজপথটি তো তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। সেই বিজ্ঞান কলেজেই যে ঘরে অন্তিম দিনগুলি পর্যন্ত তিনি বাস করেছিলেন, সেখানে আমরা তৈরী করেছি - আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মারক সংগ্রহালয়। কলেজের প্রবেশদ্বারে তাঁর সার্ধশত জন্মদিনে বসিয়েছি খ্যাতিমান ভাস্করের তৈরী ফাইবারের আবক্ষমূর্তি। কত না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সমবায় শিল্প আশ্রম ইত্যাদিতে তাঁর নাম আজও জ্বলজ্বল করছে। এরাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ভবনটিও তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত। এদেশের বৃহত্তম রাসায়নিক শিল্পতালুক যা প্রস্তাবিত হয়েছে এবং গড়ে ওঠার পথে, এ রাজ্যে সেটিরও নামকরণ হয়েছে তাঁরই নামে। তাঁকে যে মানুষ আজও ভোলেনি, আমরা ভুলিনি, তার প্রমাণ তো এসবই।

পরিবেশ সম্পৃক্ত এই উন্নয়ন-ভাবনায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্থানীয় পরিবেশ, মানুষ, সমাজ, পরম্পরাগত সামাজিক জ্ঞান, পরিবেশের জ্ঞান। প্রফুল্লচন্দ্রের সমসময়ে ... প্রায় কিছুই বিকশিত হয় নি। কিন্তু তবুও মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর উদার-মমত্ব যেভাবে প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল আজকের দিনের নিরিখে তা ছিল স্থিতিশীল উন্নয়নেরই পথ।

ঠিক কথা, এবং ঠিক নয়ও। আমরা কি তাঁর আদর্শ, তাঁর দেখানো পথ ও পদ্ধতি থেকে গ্রহণ করতে পেরেছি? উপযুক্ত অনুশীলন, বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছি? তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে আমরা কি শিক্ষা নিয়েছি? যদি আমরা তা না করে থাকি অথচ তাঁর নামে যদি আমরা মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করে যেতে থাকি, তাহলে বলতে হয় আমরা তাঁকে পূজার দেবতা বানিয়েছি, ইতিহাসের মৃত মহাত্মা করে রেখেছি। আমাদের এইসব উদ্যোগ আয়োজন নিষ্প্রাণ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এর সঙ্গে হয়তো যুক্ত হয়েছে ভণিতা, যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ-সিদ্ধির উদগ্র আগ্রহ। কিন্তু এসবে নেই আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা, নেই অধ্যয়ন-অনুশীলন বিশ্লেষণ। অথবা, আমরা কি মনে করেছি যে পরাধীন ভারতে তিনি তাঁর কর্মৈষণায় একটা ধুন্দুমার কাণ্ড বাধিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আদর্শ ও পথ ছিল তখনকার উপযোগী, এখন সেসব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে?

অবশ্য শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই না, অন্য অনেকের ক্ষেত্রেও এইসব প্রশ্নগুলিই কম-বেশী উঠতে পারে। একথা যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য আরও স্বল্পখ্যাত প্রাক-স্বাধীন ভারতের বেশ কিছু মানুষের ক্ষেত্রে। অনতি-অতীতের এইসব কর্মবীর দরদী মরমী পথপ্রদর্শকদের সুচিন্তিত পরামর্শ, কর্মকৃতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করে আজ কি আমরা জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নের চোরাবালিতে হাঁসফাঁস করছি? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের খোঁজ বা আলোচনা এক বৃহৎ জাতীয় অনুশীলন দাবী করে, একক ব্যক্তির ভূমিকা সেখানে নগন্য হলেও উপেক্ষণীয় নাও হতে পারে।

দুই।। খণ্ডে নেই অখণ্ডের অভিমুখ

আচার্য রায় ছিলেন প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও কর্মোদ্যোগের এক আশ্চর্য সংশ্লেষণ। এবং সেটা কাকতালীয়ভাবে ঘটে নি। পেছনে ছিল কঠোর সাধনা ও স্পষ্ট পরিকল্পনা, সুচিন্তিত বস্তুনিষ্ঠ প্রয়োগ-প্রচেষ্টা, প্রখর বাস্তববোধ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বিচার-বিশ্লেষণ-অনুশীলন। এগুলি ছিলো না তাঁর প্রাপ্তি, ছিল জীবনচর্চার মাধ্যমে অর্জন।

তিনি বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং গবেষক। তাঁর বিজ্ঞানী ও শিক্ষক সত্তাকে প্রসারিত করে হয়তো বা তাঁর শিল্পোদ্যোগী বা প্রাচীন ভারতীয় রসায়নচর্চার ইতিহাস রচয়িতার

ভূমিকাকে সম্পৃক্ত করে দেখা যায়, কিন্তু কিছুতেই আমরা এসবের সঙ্গে মেলাতে চাইনা তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে, সমাজচিন্তক ও সংস্কারক সত্তাকে, তাঁর রাজনৈতিক সত্তাকে। এগুলি ভুলে গিয়ে আমরা শুধু তাঁর বিজ্ঞানী ভাবমূর্তিকেই প্রাধান্য দিতে চাই। এবং ঘটিয়ে ফেলি মহা বিপর্যয় - খন্ড বিচ্ছিন্ন করে আমরা তাঁর সামগ্রিক সত্তাকেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলি, হারিয়ে ফেলি সমগ্র প্রফুল্লচন্দ্রকে। অর্ধসত্য যেমন আধখানা সত্য নয়, মিথ্যার চেয়েও কখনো বা ভয়ংকর, অংশ অংশ যোগ করেও তেমনি গোটা প্রফুল্লচন্দ্রকে পাওয়া যায় না। সমগ্র প্রফুল্লচন্দ্র অংশগুলোর যোগফলের চেয়েও অনেকটা বেশী।

প্রফুল্লচন্দ্রের সমস্ত কাজ, চিন্তা, লেখা ও বক্তব্য এক এবং একটি মাত্র উদ্দেশে প্রবাহিত। আর তা হল ভারতের মুক্তি, ভারতের আমজনতার বিশেষত দরিদ্র-নিপীড়িত -শোষিত মানুষের মুক্তি। আর তাও তখনকার জীবিত প্রজন্মের মানুষদের জন্যই শুধু নয়, অবশ্যম্ভাবী আগামী স্বাধীন ভারতের মানুষের জন্যও ছিল তাঁর যাবতীয় ভাবনা-পরিকল্পনা। বিজ্ঞানী হয়েও তিনি ছিলেন না বা হন নি গজদন্তমিনারবাসী। প্রকৃত অর্থেই, সামগ্রিক জীবনচর্চায় তিনি ছিলেন আম জনতার একজন, আপাদমস্তক ভারতীয় এবং বাঙালী। আম-বাঙালী আম-ভারতীয়ের মঙ্গলচিন্তাই তাঁর মঙ্গলচিন্তা, সাধারণত্বেই তাঁর অসাধারণত্ব। এবং এই সূত্রেই নিহিত তাঁর সত্তার অখন্ডতা।

তিন।। দেশসেবা রাজনীতির উর্দ্ধে

তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে ভুল বোঝার, ভুলে যাবার অবহেলা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছিল। বাংলা বা বাঙালীই তাঁর ধ্যানজ্ঞান এহেন যুক্তি খাড়া করে দেওয়া হয়েছিল প্রাদেশিকতার অপবাদও। বিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্ট আবহাওয়ায় তিনি নিজেকে কলুষিত হতে দিয়েছিলেন - এমন কানাকানিও হয়। কংগ্রেস পার্টির সম্মেলনে যোগদান বা কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা, প্রথমে বিরূপ থাকলেও পরে নিয়মিত চরকা-কাটা গান্ধীবাদীতে পরিণত হওয়া এইসব যদি কারও বিরক্তি উৎপাদন করে, তবে তাঁর ইসলাম-উদারতা বা হিন্দু মহাসভার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়া ছিল অন্য কারও বিরক্তির কারণ। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, অলৌকিকতা ইত্যাদিকে সামাজিক ব্যাধি ও অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং সম্মার্জনী হতে সেগুলো দূর করতে নেমে পড়াকে তো বটেই, এমনকি বাঙালীকে অলস, কর্মবিমুখ ও চাকুরিবিলাসী হিসেবে অভিহিত করাও অনেকেই সুনজরের দেখেন নি। তা যদি নাই হবে তবে ১৯৩১-এ যাঁর ৭০তম জন্মদিন টাউন হলে ঘটা করে পালিত হয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'আচার্য' সম্বোধনে ভূষিত করে প্রশস্তি করেন, তাঁরই ৮০ তম জন্মদিন পালনের জন্য যৎসামান্য অর্থসংগ্রহেও মেঘনাদ সাহাকে কেন হিমসিম খেতে হয়? * তখনও তিনি জীবিত, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় বিজ্ঞান কলেজে গৃহবন্দী। সারাজীবন ধরে যিনি বহুসংখ্যক শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নানাভাবে, বস্ত্রবয়ন, চামড়া, চিনেমাটির শিল্প থেকে ব্যাঙ্ক- জাহাজ- সমবায় পুস্তক-প্রকাশনার মত বাংলা ও ভারতীয় ব্যবসা-উদ্যোগ পর্যন্ত যাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করে সফলতার মুখ দেখেছে – সেই তাঁরাও বেশীর ভাগই বিমুখ হলেন কিভাবে? প্রাণপাত পরিশ্রম করে নিজের যৎসামান্য সম্বল উজাড় করে দিয়ে যে বেঙ্গল কেমিক্যালকে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী দাঁড় করিয়েছিলেন স্বনির্ভর ভারতীয় রসায়ন শিল্পের গর্বের প্রতীক হিসেবে, সেই কোম্পানীরই পরিচালকমন্ডলীর সদস্যরা নিজেরা লভ্যাংশের বখরা নিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন, সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা অন্তত এটুকু ত্যাগস্বীকার করে কোম্পানিকে আরও বেড়ে উঠতে সহায়তা করবেন। ১৯৪০-এই এসেছিল সেই কালো দিন যেদিন প্রফুল্লচন্দ্র বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থেকে পদত্যাগ করে চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, নীচে স্বাক্ষরের উপরে লিখেছিলেন -"BCPW (বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্) -কে যিনি একদা নিজগৃহ বলতেন, সেখান থেকে উৎপাটিত গৃহহীন আগন্তুক পি সি রায়"। ১৯৪১-এ তাঁর ৮০ তম জন্মদিন পালনে কি এই বিরোধেরই ছায়াপাত ঘটেছিল? সেটা যাই হোক, শিল্পস্থাপন বা পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর মতামত উপেক্ষা করার, তাঁকে অগ্রাহ্য করার এই যে সূত্রপাত, তা দিনে দিনে বেড়েছে বই কমেনি। স্বাধীনতালাভের পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাদের নিজেদেরই নীতি ও পরিকল্পনার ছক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদেশী মদতে বৃহৎ ও দ্রুত শিল্পায়নের পথে পা বাড়াল। ইতিহাসের মৃত নায়কেরা - প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর মত 'স্বদেশী'র প্রবক্তারা – মৌখিক প্রশস্তি ও পুজো-উপচার পেতে থাকলেন ঠিকই (সেটা রাজনৈতিক নেতাদের দেশবাসীকে দেখানো মুখোশ) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভারত গড়ে তোলায় তাঁরা পড়ে রইলেন অন্তরালে, অন্ধকারে।

চার।। ট্র্যাডিশন অব্যাহত

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা তো গ্রহণ করেইনি, এমনকি বাঙালীও তাঁকে কলকে দেয়নি। অথচ আমরা চিরকাল বিশ্বাস করতে চেয়েছি যে ভারতে আমাদের একটা পৃথক ও বিশিষ্ট অবস্থান আছে। আমরা একটু ভিন্নপথে চলি এবং ভারতের মধ্যে আমরা চিন্তা-চেতনায় অগ্রণী। গোখলের

মত কেউ কেউ আমাদের এই আত্মরতি-তে ইন্ধন যুগিয়েছেন।

ভিন্ন পথে চলার বাসনায়, ভারতকে অন্য ভাবে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখানোর প্রণোদনায় আমরা পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসকে হটিয়ে নির্বাচিত করে এনেছিলাম এক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা বিপ্লববাদী রাজনৈতিক দলকে। ভেবেছিলাম যে স্বাধীনতার পর তিরিশ বছর ধরে কংগ্রেস যে সব ভুল করেছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে যেসব ত্রুটি ও অপরাধের বীজ - তা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা নিজেদেরকে উত্তীর্ণ করবো এক নতুন আলোর ভোরে। কিন্তু হায়, আরও ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর হঠাৎই আমরা আবিষ্কার করলাম - অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে - প্রফুল্লচন্দ্ররা আজও উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং অপমানিত।

পাঁচ ।। বিজ্ঞানী-কত দড় ?

একথা ঠিক যে বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা-কে কেন্দ্র করেই প্রসারিত হয়েছে আচার্য রায়ের জীবন ও কর্ম। এক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছু কি ছিল, যা স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য ছিল ? এ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ আছে, কিন্তু কিছু ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করাই যায়।

সম্প্রতি আমরা বিতর্কে মেতেছি বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর দর বা গ্রেড নির্ণয়ে। * আচার্য রায়ের ছাত্রের ছাত্র, অজৈব রসায়নের প্রখ্যাত অধ্যাপকের মতে - যে মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার কে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের মহা সাফল্য গণ্য করে বাঙালী আত্মশ্লাঘা অনুভব করে, সেই বস্তুটারই অস্তিত্ব নেই। তাত্ত্বিক বিচারেও তার অস্তিত্ব অসম্ভব - যা পরে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব সমসাময়িক প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একাসনে তাঁর ঠাঁই হয় না।

এও বাঙালীর এক মহা-আবিষ্কার বই কি! বিজ্ঞানে কি এমনটা হল শুধু প্রফুল্লচন্দ্রের বেলাতেই ? বিজ্ঞানের ইতিহাসে কত কত 'আবিষ্কারই' তো ভুল বা অসম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। সংশোধিত হয়েছে। আক্ষরিকভাবেই সত্যি যে অসংখ্য 'ভুলের' ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে এবং হয় বিজ্ঞানের সাফল্যের ইমারত। অন্তিম ফল বা সাফল্য-অসাফল্যের নিরিখে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর বিচার হয় না, পদ্ধতি এবং পথটাই সেখানে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গবেষণার জন্য যে পথ ও পদ্ধতি তৈরী করেছিলেন, সেই পথ ও পদ্ধতির কোন পুরনো প্রচলিত চিহ্ন বা রেখা ছিল না, শাসক-ইংরেজরা ভারতীয় বিজ্ঞানশিক্ষকের জন্য কোনরকম সাহায্য সহযোগিতাতেও ছিল কৃপণ, এমনকি বিরূপ, তখন তিনি রসায়নের গবেষণার যে পথ ও ঘরাণা তৈরী করতে পেরেছিলেন, তাই ভাঙিয়ে আজও আমরা করে কম্মে খাচ্ছি; এবং তাকে প্রসারিত ও উন্নত করতে ব্যর্থই হয়েছি। তাতে লজ্জিত না হয়ে, আমাদের ব্যর্থতার পর্যালোচনা বা কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী না হয়ে যদি আজ আমরা বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের পংক্তি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই, তবে তা হয় সস্তায় বাজীমাত করার নামান্তর।

বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর শ্রেণী নির্ণয়ের এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেও আমরা ধার করেছি পশ্চিম থেকেই। পশ্চিমী চশমা দিয়েই আজ আমরা বিচার করতে বসি যাবতীয় সাফল্য অসাফল্যকে। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাসের নিরিখে আমাদের নিজস্ব বিশিষ্ট কোন অবস্থান নির্ণয় করতে আজও আমরা ব্যর্থ। অথচ প্রফুল্লচন্দ্ররা সেটাই প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার পাশাপাশি ভারতের থাকবে একটি নিজস্ব পরিচয় - তার নিশ্ (niche) - এটাই মনে হয় তাঁর থেকে গ্রহণীয় শিক্ষার সারমর্ম।

আমরা যেসব ইংরেজী বইপত্র পড়ি - প্রধানত ইউরোপ আমেরিকার - তাতে যেসব বিজ্ঞানীদের মহা-বিজ্ঞানী হিসেবে তুলে ধরা হয়, যেভাবে তাঁদেরকে কীর্তিত করা হয়, নির্বিচারে আমরা সেই মূল্যায়ন গ্রহণ করি। ভুলে যাই যে বিজ্ঞানের যে কোনো একটি ক্ষেত্রেও সামগ্রিক উন্মোচন-উদঘাটনে অসংখ্য বিজ্ঞানীর অবদান থাকে, তার মাত্র দু-একজনের নামই পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, অনেক সময় ভুলভাবেও। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও কি আমরা এই চশমাতেই দেখবো, এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করবো ? ইংলান্ডে থেকে গিয়ে সেখানকার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে তিনি এবং তাঁর মত আরও কিছু বাঙালী ভারতীয় প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর খ্যাতি অর্জন করতেই পারতেন। সে পথ ত্যাগ করে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা ও সেবায় আত্মোৎসর্গ করা বোধহয় ছিল তাঁদের মূল অপরাধ। এই যদি আমাদের মনোভাব না হয়, তাহলে এই অপ্রাসঙ্গিক ছোট্ট প্রশ্ন বিরাটাকার ধারণ করে মাথা চাড়া দেয় কিভাবে?

ছয় ।। শিক্ষা অশিক্ষা কুশিক্ষা ও ফাঁকতাল

শিক্ষা, বিশেষত শিক্ষার গোড়াপত্তন এবং বিজ্ঞানশিক্ষা ছিল আচার্যের আগ্রহের অন্যতম কেন্দ্র। সেই কবে উনিশ শতকের গোড়ায় গোপালকৃষ্ণ গোখেল সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী জানিয়েছিলেন ইংরেজ শাসকের দরবারে। বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী প্রফুল্লচন্দ্রের তাতে ছিল প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ। অর্থাভাবের অজুহাতে ইংরেজ সরকার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, সেটা অস্বাভাবিক নয়, ভারতীয় উপনিবেশের সার্বজনীন শিশুশিক্ষা তাদের অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও বার বার সেই প্রস্তাব রয়ে গেল নানা কমিটি-কমিশনের

নিরোপেক্ষী হয়ে সুদীর্ঘ বাষট্টি বছর। অবশেষে অবশেষে প্রণীত হয়েছে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন শিক্ষা অধিকার আইন-এই তো সেদিন ২০০৯-এ। কিন্তু তার মূল উদ্দেশ্য কতখানি শিক্ষার বিস্তার আর কতখানি বাণিজ্যের তা বিচারসাপেক্ষ।

আচার্যের নিজের শিক্ষা ও জীবন এব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খুলনার গ্রামের স্কুলে আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর সঙ্গে শুরু হয় স্কুলে যাওয়া স্কুলটা আবার তাঁরই বাবার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁরই মায়ের নামে। রুগ্ন শরীরের জন্য ভালোমত পাঠশালায় যাওয়া হতো না। পরে দশ বছর বয়সে কলকাতায় এসেও অসুস্থতার জন্যই দীর্ঘ সময় স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। বাড়ীর লাইব্রেরী আর গ্রামের মাঠ ঘাট প্রান্তর বাগান কৃষিক্ষেত্র এগুলিই ছিলো তাঁর প্রকৃত পাঠশালা, রবীন্দ্রনাথের (এবং আরও অনেক বিখ্যাত মানুষের) সঙ্গে তাঁর 'শিক্ষায়' অনেকটাই মিল আছে। শিক্ষার নামে অপ্রয়োজনীয় অনুশাসনের বেড়িতে তাঁদের স্বকীয় পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ শক্তি শৃঙ্খলিত হতে পারে নি। শৈশব চুরি হয়ে যেতে পারেনি।

আচার্য নিজেও এ ব্যাপারে সচেতন ও অবহিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতার শুরুর পর্বেই ছোটদের জন্য বিজ্ঞানশিক্ষার বই রচনাতে হাত দিয়েছিলেন। রসায়নের প্রাথমিক শিক্ষার বই লিখতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন - রসায়ন নয় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রতিই শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আর কৌতূহল। রসায়নের বই লেখা অসমাপ্ত রেখে মন দিলেন সেদিকে। নতুন করে দস্তুরমত পড়াশোনা শুরু করে দিলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বাদ গেল না। প্রচুর পরিশ্রম করে লিখলেন 'সরল প্রাণীবিজ্ঞান'। তাঁর উপলব্ধির কথা লিখেছেন আত্মস্মৃতিতে - ইংলন্ডের আবহাওয়ায় প্রকৃতি রুক্ষ, শ্যামলিমাহীন, অনেকটাই নিষ্প্রাণ। কিন্তু এই বাংলায় প্রকৃতিথরে থরে সাজিয়ে রেখেছে জীবন্ত সব উপাদান। আমাদের প্রকৃতি এক বিস্তৃত উন্মুক্ত ল্যাবরেটারি।

শিশুর শিক্ষায় গোড়াপত্তনে আমরা কি তাঁকে মনে রেখেছি। তাঁর এই ভাবনা তো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনারই পরিপূরক। এঁদের কাউকেই কি আমরা গ্রাহ্য করেছি? এমনকি এই হালে যখন পরিবেশশিক্ষা নিয়ে রীতিমত শোরগোল - জাতিপুঞ্জ থেকে দেশের সুপ্রিম কোর্ট সকলে মিলে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র পরিবেশকে অবশ্যপাঠ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, তখন, শিশুদের এই স্বাভাবিক আকর্ষণের ক্ষেত্রটাই কেমন অবলীলায় হয়ে পড়লো একটা পুঁথিগত নীরস 'বিষয়' - যাতে পাশ করতে হয়। আর তাই হয়ে গেলো শিক্ষার্থী-শিক্ষক অভিভাবক সকলের কাছে এক বিভীষিকা।

প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের কাছে নিছক শিক্ষক ছিলেন না, ছাত্ররা তাঁকে বন্ধু হিসেবেই গণ্য করতে পারতেন। ব্যক্তিগতভাবে সকলের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর যেমন নিতেন, তেমনি দরকারে সাহায্যও করতেন। তাঁর কাছে পড়াটা হতো এক আড্ডাও, কারণ তিনি সিলেবাস ধরে পড়াতেন না। বিষয় অবতারণা করতেন ঐতিহাসিক পটভূমিতে। ক্লাশে পরীক্ষা ও প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা থাকতো। তাই তিনি পারতেন শিক্ষার্থীর 'চিত্তকে উদ্বোধিত' করতে। তাঁর হাতে গড়া ছাত্রদল আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশের কোণে কোণে এবং বিদেশেও। আজও যাঁরা তাঁকে শিক্ষকতার আদর্শ জ্ঞান করেন, তাঁরা বিরল তো বটেই, নিতান্ত স্বল্পও।

বিজ্ঞানী হিসেবে অসাধারণত্বের দাবী আচার্য নিজে কোনদিন করেন নি, বরং শিক্ষায় 'সামান্য সেবা' করার চেষ্টা করেছেন, এমনটাই তিনি বলেছিলেন ১৯২৩ সালে আলিগড় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সমাবর্তন ভাষণে - '..... ..... দেশের শিক্ষার ব্যাপারে আমার সামান্য সেবার সুবাদেই সম্ভবত আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন; ঠিকই তো শিক্ষাতেই তো নিহিত আছে ভারতের মুক্তি।' সেখানে তিনি আরও বললেন - 'ইঁট সিমেন্ট নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় সংশ্লিষ্ট মানুষ ও তাদের দ্বারা রচিত বিদ্যার আবেষ্টনীতে। স্যার আশুতোষের 'ফ্রিডম ফার্স্ট, ফ্রিডম সেকেন্ড, ফ্রিডম অলওয়েজ' নির্ঘোষই হওয়া উচিত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চলার পথের মন্ত্র; পক্ষপাত, অসহিষ্ণুতা ও যুক্তিহীনতাই মানব প্রগতির প্রধানতম শত্রু'।

১৯২৬ এবং ১৯৩৩-এ ও তিনি মহীশূর এবং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এইসব ভাষণের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর কাছে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত বিস্তৃত ও স্পষ্ট করেন। শিক্ষার তিনটি মৌলিক ত্রুটি চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। প্রথম, বিদেশী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা, দ্বিতীয়, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রকৃত মেধাবী ও আগ্রহী শিক্ষার্থী বাছাই করতে না পারা এবং তৃতীয়, শিক্ষার্থীদের নিষ্ক্রিয় শ্রোতায় পরিণত করা; এবং তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মে অংশীদার হবার সুযোগ না দেওয়া। ব্রিটিশরা ভারতের মাটিতে স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই রোপন করে গেছেন আমরাও শাসকদের হাতে সে দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্তে থেকেছি। আমাদের চাই ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - এই ছিল তাঁর অভিমত।

আজ স্বাধীনতার তেষট্টি বছর পরও কি আমরা শিক্ষাকে

এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত করতে পেরেছি, নাকি এগুলি আরও জেঁকেই বসেছে? পেরেছি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব ও অসহিষ্ণুতার আস্ফালন বন্ধ করতে? নাকি সেগুলি আরও জাঁকিয়ে বসেছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'স্বাধীনতা'র উপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আমরা তার কতটুকু মর্যাদা দিয়েছি? তাঁর নিজের শহরে কলকাতায়, এই রাজ্যে! ভুক্তভোগী মাত্রই আমরা এখন অবহিত যে একেবারে প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখন কেমন পক্ষপাত, অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেসব আলোচনা আরও বিস্তৃত না করে উৎসাহী পাঠকদের বলবো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্যের বইটি* নেড়েচেড়ে দেখতে।

শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহার নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের (এবং আরো অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের) ভাবনার শরিক হতে পারিনি আমরা। কারণ, তাতে আমাদের বিশ্বাস বা আস্থা কোনটাই ছিলো না। নিজেদের এবং সম্পন্ন ঘরের শিশুদের জন্য ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের ঢালাও ব্যবস্থা করে সরকারী স্কুলে জবরদস্তি ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করার প্রয়াসও পেয়েছি। বিপরীত তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজী শিক্ষার সদ্গতি তো হয়েছেই, মাতৃভাষার স্বাভাবিক বিকাশও রুদ্ধ হতে বসেছে। পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীর শিক্ষাই যাঁরা তুলে দেবার কাণ্ডারী ছিলেন, তাঁরাই আবার তা ফিরিয়ে আনলেন এবং সেখানে থেমে না থেকে সরকারী মাধ্যমিক স্কুলেও পৃথক ইংরেজী মাধ্যমের ঢালাও বন্দোবস্ত করলেন।

যা যা প্রফুল্লচন্দ্রদের মতে ছিল শিক্ষার মৌলিক ত্রুটি তার অনেকগুলিই এখন আমাদের নতুন ভাষ্যে শিক্ষার মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য। কারণ এখন আমরা তাবৎ শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই - উন্মুক্ত অর্থনীতির আরো ভালো সেবার জন্য। আমেরিকার সঙ্গে নতুন করে গাঁটছড়া বেঁধে 'নলেজ ইউনিভার্সিটি', 'ইনোভেটিভ ইউনিভার্সিটি' গড়বার ব্যবস্থা পাকা পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আর ভরসা রাখা যাচ্ছে না।

সাত।। পরিবেশে ওতপ্রোত

নিজের বাল্য-শিক্ষায় প্রকৃতি-পরিবেশের বিরাট ভূমিকা থাকায় আচার্য রায় একজন প্রকৃতি অনুসারী শিক্ষাবিদ হয়ে উঠেছিলেন সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই, সহজাত টানে। বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে পরিবেশ ও ইকোলজি'র জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটেছে বলা যায়। এখনকার এই জ্ঞান ও বিদ্যের আলোকে যদি একটু পিছু ফিরে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে প্রফুল্লচন্দ্রকে এদেশে পরিবেশ ভাবনার ও এক পথিকৃৎ বলা যায়।

এডিনবরায় থাকার সময়ে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন যে ইউরোপ ও আমেরিকায় উনিশ শতকের শেষ দিকে বহু সংখ্যক গোষ্ঠী বা ক্লাব গড়ে উঠেছে, প্রকৃতি ঘিরে ছিল যাদের নানারকম 'নেশা'। প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষকতার গোড়ার দিকেই, ১৮৯২ সালেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'নেচার ক্লাব'। সঙ্গী জুটেছিল ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রামব্রহ্ম সান্যাল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রমুখরা, যাঁরা প্রত্যেকেই পরে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন। কলকাতার ময়দান ছিল তাঁর বৈকালিক নিত্যভ্রমণের প্রিয় জায়গা, বলতেন যে ময়দানটা হল কলকাতার ফুসফুস। শিক্ষকতার অবসরে, বিশেষত গ্রীষ্মাবকাশে তিনি নিয়মিত গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন, প্রত্যক্ষভাবে কৃষি ও ক্ষেতের কাজে যুক্ত হতেন। বিজ্ঞান কলেজে তাঁর ল্যাবরেটারিতে-জল, নানারকম বিকারক রাসায়নিক এবং দুষ্প্রাপ্য যেসব ধাতু বা ধাতব লবণ যেমন পারদ, সোনা, রূপো, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতু বা তাদের যৌগ-নিয়ে কাজকর্ম হতো সেগুলোর যাতে একটুকু* অপচয় না হয়, সেদিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। কাজ করতে গিয়ে বা অসাবধানে মেঝেতে পড়ে যাওয়া ধাতুগুলি আবার কুড়িয়ে নিয়ে উদ্ধার করে কাজে লাগাতে হতো তাঁর ছাত্রদের।

* প্রাথমিকভাবে, খরচের দিকটাই হয়তো তখন প্রাধান্য পেত কিন্তু আজ আমরা জানি, অপচিত পদার্থের প্রতিটি অনু-পরমাণু দূষণের বোঝার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবাধার বিশ্বকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এও আজ আমাদের জানা আছে যে ফেলে দেওয়া বা ছড়িয়ে পড়া এসব ধাতু-লবণ-রাসায়নিক কর্মীদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও মারাত্মক ক্ষতিকর। পুনর্ব্যবহার ও পুনশ্চক্রায়ন (Recycling) প্রকৃতিরই নিয়ম, এবং এই অর্থে প্রকৃতি অনুসারী হওয়াই পরিবেশ সুরক্ষার প্রথম পাঠ। এবং এই সূত্রেই রসায়ন পুনরুজ্জীবিত হবার প্রয়াস পাচ্ছে আজ, দূষণের অপবাদ ঘোচাতে 'গ্রীণ কেমিস্ট্রি'র চর্চা বেড়ে উঠছে, ব্যাপ্ত হচ্ছে। এখনকার এইসব তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা তখন জানার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু শিক্ষা, শিল্পোদ্যোগ, ও জীবনচর্চা-সর্বত্রই প্রফুল্লচন্দ্র সহজ স্বাভাবিকতায় অনুসরণ করেছেন প্রকৃতির নিয়মের পথ, পরিবেশ দূষণ এড়ানোর পথ।

আট।। স্বাভিমানী শিল্পোদ্যোগ

পরীক্ষা ও প্রয়োগ ছাড়া বিজ্ঞান সম্পূর্ণতা পায় না। তত্ত্ব নিয়ে কসরৎ ও মগজের ব্যায়াম তখনই সার্থকতা পায় যখন তা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। আর গবেষণাগারের

---

* Red Hammer over Calcutta University (1984-87) - A Statesman Publication

পরীক্ষা বা বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি যখন শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগার উপকরণ উৎপন্ন করে তখন যে কোন বিজ্ঞানী তৃপ্তি বোধ করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিজ্ঞানের - প্রায়োগিক দিকের প্রতি যে আগ্রহ তা শুধুমাত্র এই তৃপ্তিলাভের জন্য ছিল না, ছিল তার চেয়ে আরও অনেক বেশী।

ইউরোপের উন্নতিতে রসায়নশিল্পের ভূমিকা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। রসায়নের মারণভূমিকা তখনও অনেকের কল্পনার অতীত ছিল। বরং ইউরোপ তখনও (উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে) রসায়নশিল্পের কল্যাণী ভূমিকায় আপ্লুত। লুই পাস্তুর, যোসেফ লিস্টার, জুস্টাস ফন লিবিগ প্রমুখদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। বাঙালীর এবং ভারতের ভবিষ্যৎ যাঁকে ব্যাকুল করে তিনি স্বভাবতই ঝুঁকলেন ফলিত রসায়নের দিকে, রাসায়নিক শিল্পের দিকে। প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতা শুরুর বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র - যা প্রকাশিত হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৮৯৪ সালে - তার শিরোনাম ছিল, 'কেমিক্যাল এক্সামিনেশন অফ সার্টেন ইন্ডিয়ান ফুডস্টাফ, পার্ট-ওয়ান ঃ ফ্যাটস্ অ্যান্ড অয়েলস'। ভারতের ভোজ্য তেল ও তেলজাত পদার্থের ভেজাল সনাক্তকরণ ও নিবারণের লক্ষ্যেই তিনি তাঁর প্রথম গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। আজও এটি একটি জ্বলন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

অচিরেই তিনি কারখানা গড়ার স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্ন সঞ্চারিত করতে উদ্যোগী হলেন। ভাড়া করা নিজ বাসস্থানেই চলল তার মহড়া। কারখানায় কি উৎপাদন হবে, কাঁচামাল কোথা থেকে আসবে, যন্ত্রপাতি কত কি লাগবে, কোথায় সেসব পাওয়া যাবে, উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে কোথায় কত দামে বিক্রী করা যেতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে চলল সমীক্ষা, বিচার -বিশ্লেষণ। উৎপাদন পদ্ধতিও হাতে কলমে যাচাই করার ব্যাপারেও তিনিই মূল কর্মী। প্রায় একক প্রচেষ্টায় নিজের জমানো মাত্র আটশো টাকা সম্বল করে গড়ে উঠল বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস (BCPW) -ভারতের প্রথম ভারী রাসায়নিক শিল্প, স্বনির্ভরতার প্রতীক। শিল্পটির নামকরণ নিয়েও হলো অনেক ভাবনাচিন্তা। অবশেষে যে নামটি পছন্দ হল - তা ছিল অত্যন্ত যথাযথ। নামের মধ্যেই ঘোষিত শিল্পের অভিমুখ। এমন এক শিল্প যা উৎপাদন করবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি। শিক্ষা ও গবেষণার কাজেও এসব রাসায়নিকের প্রয়োজন হতে পারে। হয়েছিলও। ১৯০৫ সালে মানিকতলায় নিজস্ব বাড়ীতে কারখানা স্থানান্তরিত হল। তারপর তাঁর জীবিতকালে আরও দুটি শাখা তৈরী হয়, যথা ক্রমে পানিহাটি, ২৪পরগণায় (১৯২০) এবং মহারাষ্ট্রের বোম্বাইতে (১৯৩৮) তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৪৯) কানপুরে আরও একটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল।

আচার্যের কাছে এই শিল্প ছিল না শুধু শিল্পের জন্য, ব্যবসা-মুনাফার জন্য বা ব্যক্তিগত অর্থ-প্রতিপত্তির জন্য এ ছিল তাঁর স্বপ্নের বাহন - শ্রমবিমুখ বাঙালীকে শ্রমের মাহাত্ম্য বোঝাতে হবে, ব্যবসা ও ব্যবসায়ীর প্রতি এ জাতির বিরূপতা ঘোচাতে হবে। কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার পথ দেখাতে হবে। হাত আর মগজের মেলবন্ধন ঘটাতে হবে। আর এসবের জন্য - শিল্পের প্রসারের জন্যও- চাই নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা, প্রাসঙ্গিক নানা নতুন উৎপাদন। স্বদেশী ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের অংশগ্রহণ ও অনুপ্রেরণায় অভাবনীয় সব উদ্ভাবন ঘটালেন সাধারণ মিস্ত্রী কর্মীরাই। এইভাবেই BCPW-তে উদ্ভাবিত হল লোহার পাতের উপর সীসার প্রলেপ লাগানোর পদ্ধতি, যার জন্য সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী সম্ভব হয়েছিল মেডিকেটেড তুলোর ব্যান্ডেজ-এর প্যাকিং পদ্ধতি ও যন্ত্র, অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র এসবও কারখানার ভিতরেই উদ্ভাবিত হল।

বর্জ্য পদার্থ, যেমন ফেলে দেওয়া লোহা, পশুর হাড় ইত্যাদি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে তৈরী করা হলো, ওষুধ, সার। জল শোধনের জন্য ফটকিরি উৎপাদনের কৃৎকৌশলও পরীক্ষা ব্যর্থতার গণ্ডী অতিক্রম করে সাফল্য পেল।

ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদকে উপজীব্য করে যে মূল্যযুক্ত কার্যকরী স্বাস্থ্য-উপকরণ তৈরী করতে পারা যায়, তাও দেখালো BCPW ও তার কর্মীরা। বেঙ্গল কেমিক্যালের কালমেঘ, কুর্চি, জোয়ানের আরক, ফিনাইল বহুদিন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিল। সম্প্রতি এদিকে বহুজাতিকদেরও দৃষ্টি পড়েছে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে আচার্য বলেছিলেন, 'অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হলে দেশকে তার প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।' নাগপুরে অনুষ্ঠিত সপ্তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে (১৯২০) সভাপতির অভিভাষণে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান, কারিগরী ও জীববিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য ধনী দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানালেন এবং ছোট বয়স থেকেই যাতে করে দেখার, পর্যবেক্ষণ করার আগ্রহ জন্মে, তেমন একটা সংস্কৃতির প্রয়োজনের কথা বললেন। তাঁর যাবতীয় কর্ম ও ভাবনা ঘিরে ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান কলেজের ভিতরেই ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠায় (১৯২০) ছিল আচার্য রায়েরই

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগ নতুন এই বিভাগকে গড়ে তোলার জন্য যিনি প্রথম বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিলেন সেই হেমেন্দ্রকুমার সেন, আচার্য রায়েরই কৃতি ছাত্র যাঁর সম্পর্কে আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন - টেস্ট টিউবের মত লেখনী ধরণেও তিনি সুপটু ছিলেন।

এই ভাবে আচার্য রায় শিল্পোদ্যোগ এবং কারিগরী শিক্ষার যোগসূত্র প্রদর্শন করেছিলেন যাতে আমরা, তাঁর উত্তরসূরীরা, শিল্প-বিজ্ঞানে ভারতের একটা নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলতে পারি, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। আমরা কিন্তু যথারীতি প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা উপেক্ষা করলাম, তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণে যত্নশীল থাকতে পারলাম না। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে বেঙ্গল কেমিক্যাল রুগ্ন হতে থাকল। সরকারী অধিগ্রহণের ভর্তুকির অক্সিজেন যুগিয়েও তাকে আর চাঙ্গা রাখা যাচ্ছে না। অথচ তার সুযোগ ছিল না এমন নয়।

অনেকদিন ধরেই অ্যালকোহল তৈরী করতো বেঙ্গল কেমিক্যাল। সেই অ্যালকোহল (রেকটিফায়েড স্পিরিট) কলকাতা ও আশেপাশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় এবং চিকিৎসালয়গুলির প্রয়োজনের অনেকটাই মেটাতো। সম্প্রতি হঠাৎই সে উৎপাদন বন্ধ হল। খোঁজ করতে জানা গেল পুরণো প্ল্যান্ট বাতিল করে নতুন প্রযুক্তিতে নতুন প্ল্যান্ট বসাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল কোম্পানি। প্ল্যান্ট বসাবার জন্য জমি জরিপ করতে গিয়ে দেখা গেল, মানিকতলার বেঙ্গল কেমিক্যালের সেই জমি মনি স্কোয়ার মল নামক এক সুপারমার্কেটের দখলে। কিভাবে এই হস্তান্তর ঘটলো, কবে, তা জানা যায় নি।

ইথাইল অ্যালকোহল এখন মহার্ঘ রাসায়নিক। পেট্রোলিয়ামের বিকল্প হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্রাজিল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে - কৃষি, গবেষণা, শিল্প, পরিবহন, সরকারী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করে তিন চার দশকের চেষ্টায় ব্রাজিল সফল হয়েছে এবং পেট্রোলিয়ামের আমদানী প্রায় অর্ধেক নামিয়ে এনেছে। ১৯৩০-৪০ এর দশকে প্রযুক্তিগত ভাবে ব্রাজিলের থেকে অনেক ভালো জায়গায় ছিলো ভারত। আমাদের ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল। কিন্তু আমরা এখন পেট্রোলের সঙ্গে পাঁচ শতাংশের বেশী অ্যালকোহল মেশাতে পারছি না। কারণ তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অ্যালকোহলের উৎপাদন নেই দেশে। পেট্রোলিয়াম আমদানীর পরিমাণ ও খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। অথচ আমাদের আছে চুল্লুর কুটির শিল্প। চুল্লুও সেই অ্যালকোহল। তার উৎপাদন ও ব্যবসার রমরমা। বিষাক্ত চুল্লু পান করে প্রতিবছর কয়েকশো করে গরীব নেশাখোর মানুষ বেঘোরে প্রাণ দেন। আবগারী-খাতে সরকারের আয় বাড়তেই থাকে।

এসবের পটভূমিতেই দেশ পেট্রোরসায়নের মেগা শিল্পতালুক গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূল মোহানায় ২৫০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে এই মেগা শিল্পতালুক গড়ার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। তার নামকরণ করা হয়েছে, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পেট্রোকেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড'। কি নিষ্ঠুর পরিহাস। যে সর্বত্যাগী জ্ঞানতপস্বী রসায়নের শিক্ষা-গবেষণার ভারতীয় ঘরাণার উদ্গাতা, যিনি রসায়নশিল্পের সমাজ ও মানবমুখী স্বাধীন ও সচেতন একটি অভিমুখ নির্দেশ করে গেছিলেন, সেই প্রফুল্লচন্দ্রের নামেই কিনা পরিচিত হবে, সম্পূর্ণভাবে আমদানীকৃত কাঁচামাল পেট্রোলিয়াম নির্ভর, মানুষ, ও পরিবেশের উপর আরোপিত 'কেমিক্যাল হাব'? প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, মালিকানা, বাজার সব দিক থেকেই যা বহুজাতিক কোম্পানীর কুক্ষিগত?

রুগ্ন বেঙ্গল কেমিক্যালকে পুনরুজ্জীবিত করার আরও নানা সুযোগ গ্রহণ করা যেত। দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য সস্তায় বৈজ্ঞানিক (জেনেরিক) নামে জীবনদায়ী ওষুধের উৎপাদক হিসেবে বেঙ্গল কেমিক্যাল অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারতো। এ ব্যাপারে ভারত সরকার নীতি গ্রহণ করেছে বেশ কয়েকবছর আগেই ভারতেরই বেশ কয়েকটি রাজ্য (মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ুর নাম করা যায়) যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদন বিপণনের ব্যবস্থা করতে পারলেও, পশ্চিমবঙ্গে অগ্রগতি যৎসামান্য, প্রচেষ্টাও আন্তরিক নয়। স্বাধীন ভারতে বহু কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিজ্ঞান-কারিগরী শিক্ষা-গবেষণা এবং শিল্প যেন দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। শিক্ষা আর শিল্পের এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের বিজ্ঞান-কারিগরীর শিক্ষার যে এক বড়ো ত্রুটি, তা সেমিনারে আলোচনায় স্বীকৃত হয় কিন্তু দূরত্ব আর ঘোচে না। শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে শিল্পের নিবিড় যোগাযোগের কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাই এখানে করা গেল না। এমনকি প্রফুল্লচন্দ্র হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই রসায়ন বা ফলিত রসায়নের পঠন-পাঠন- গবেষণার সঙ্গে বেঙ্গল কেমিক্যালের কোন আত্মিক যোগসূত্র গড়ারও প্রয়াস নেওয়া হল না।

নয়।। খুঁড়ে দেখো ইতিহাস

শিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা থেকে প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা ছেঁটে ফেলেছি। শিল্পস্থাপনে তাঁর দেখানো স্বকীয়তা, স্বনির্ভরতার পথও আমরা পরিহার করেছি। বিজ্ঞানী হিসেবেও তাঁর মধ্যে আমরা

কোন অসাধারণত্ব দেখতে পাচ্ছি না। সেক্ষেত্রে, দু-খণ্ড 'এ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রির' প্রণেতাকে কে আর মনে রাখে? অথচ আচার্যের নিজেরও একসময় মনে হতো যে আর কোন কিছুর জন্য না হোক অন্তত এই কাজের জন্যই তিনি দেশবাসীর মনে দীর্ঘস্থায়ী আসন পেতে পারেন। শুধুমাত্র এই কাজের জন্যই একজনের সারাজীবন লেগে যেতে পারে। অন্য দেশে এমন বহু নজির আছে। আমরা কিন্তু একে 'বৈজ্ঞানিক কর্ম' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। ফরাসী রাসায়নবিদ ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রণেতা বার্থেলো'র কিন্তু রত্ন চিনতে অসুবিধে বা দেরী হয়নি। এই দুরূহ ও অসম্ভব পরিশ্রমের কাজটা যে প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যই সম্ভব হয়েছিল, একথা অনুধাবন করতে আমাদের আজও অসুবিধা হয়। সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

'হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি'র জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছিল। ভগ্নস্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়েছিল। এবং, তাঁর নিজেরই কথায়, সমসাময়িক রসায়নের অগ্রগতির খোঁজখবরও তিনি ঠিকঠাক রাখতে পারেন নি। কিন্তু তবুও তিনি নিরস্ত হতে চান নি। দেশের অতীত গৌরবের অনুসন্ধানই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তিনি ব্রতী হয়েছিলেন সেইসব আর্থসামাজিক কারণের উদঘাটনে যা একসময় বিজ্ঞানচর্চার অনুকূল হয়েছিল কিন্তু পরে প্রবল প্রতিকূল হয়ে ওঠে, ভারতে বিজ্ঞানচর্চার গতি রুদ্ধ হয়। একে বলা যায় 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' সোজাভাবে, 'সোশিওলজি অফ সায়েন্স'। বা একটু ভিন্নভাবে 'সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটি' নামে এখন পৃথিবীর সর্বত্র এর চর্চা হয়। নীডহ্যাম, বার্ণাল বা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের অনেক আগেই ভারতে তার সূচনা করেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রই। ঐতিহাসিক শিকড় সন্ধান করে তিনি দেখালেন, কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের সংশ্লেষণই একসময় ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও তার অগ্রগতিকে ধারণ করতে সমর্থ হলেও, পরে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন, জাতিভেদ এবং সংশ্লিষ্ট বহু বহু 'তুচ্ছ আচারের মরুবালারাশি' বিজ্ঞান ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতার উঁচু দেওয়াল তুলে দিয়েছিল, নিভে গিয়েছিলো জ্ঞানের আলো।

হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রির মাধ্যমেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর শিক্ষকসত্তাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের গণ্ডী পেরিয়ে সমগ্র ভারতে এমনকি আন্তর্জাতিক আঙিনাতেও পৌঁছে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে হয়তো আর কোন ইতিহাসবিদকে গবেষণা করে খুঁজে পেতে হবে যে এর পরেও বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন ভারতে কেন এবং কিভাবে প্রফুল্লচন্দ্র অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন, ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পায়ন দেশের মানুষ মাটি ও পরিবেশের চিহ্ন ধারণ করে মাথা তুলতে পারলো না।

দশ।। দেবতা নন - মানুষই

প্রফুল্লচন্দ্র মানুষই ছিলেন, অতিমানব নয়। তাই ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে আপোষীও মনে হয়। আচার্য রায়কে আমরা এখনও অনেকসময়ই 'স্যার' প্রফুল্লচন্দ্র হিসেবে তুলে ধরতে ভালোবাসি। তাঁর 'নাইটহুড' প্রাপ্তিকে এক বিরাট কৃতিত্বের নিরিখ হিসেবে দেখি। কিন্তু এও আমাদের ভ্রান্তিই। ইংরেজদের দেওয়া সি. আই. ই (CIE) বা নাইট উপাধি তাঁর কাছে খুব গৌরবের ছিলো না বলেই মনে হয়। বরং হয়তো 'বোঝা'ই ছিলো। প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার দীর্ঘ 'আত্মচরিতে' কোথাও তিনি তাঁর এই দুই উপাধিপ্রাপ্তির কথা নিজে থেকে উল্লেখ করেন নি। উল্লেখ আছে স্যার আশুতোষ মুখার্জির চিঠিতে এবং অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের ভাষণে। 'আত্মচরিতে' এ দুটির উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে তথ্যটি দেওয়া হয়েছে। নাইটহুড প্রাপ্তি বিষয়ে কৌতুকের সুরে তিনি বলেওছিলেন - 'মহামান্য ভারত সরকার আমায় দিনের আলোয় ফেলিয়া না রাখিয়া রাতের অন্ধকারে মিশাইয়া দিতে চান।' কেন তিনি বলেছিলেন এমন কথা? মনের মধ্যে কোন গ্লানি বা অস্বস্তির ছোঁয়া ছিল কি?

সাধারণভাবে প্রফুল্লচন্দ্র ব্রিটিশ বিজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলার যতখানি কদর করতেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তিনি ততখানিই বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এডিনবরায় 'India Before and After Mutiny' প্রবন্ধে তিনি সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তার পরও তাঁর এই বিরূপতা বার বার প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন না কোনমতেই তবুও তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নয়, সম্ভবত প্রথম মহাযুদ্ধে সংকটের সময়ে তিনি উদার সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন বলেই। তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক - "নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেটস বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীর প্রধান উপাদান। .....বাহির হইতে এইসব জিনিষের আমদানি বন্ধ হওয়াতে জার্মান রাসায়নিকেরা নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ....ব্রিটিশ রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিকগণও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন। লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এই সময়ে আমার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। ....এখান হইতে গবর্নমেন্টকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অ্যাসিড সরবরাহ করা হইল। মেসোপটামিয়ার বারুদ ও বিস্ফোরকের গুদামের জন্য এগুলি চালান দেওয়া হইয়াছিল। ...."

যে বছর তিনি নাইট উপাধি পেলেন, সেই বছরেই

(১৯১৯) কলকাতার টাউন হলে রাউলাট আইনের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। রাউলাট আইনে পুলিশকে যে কোন নাগরিককে সন্দেহবশে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করে রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র মনে করেছিলেন দেশের জন্য এই আইন 'ঘোর অনিষ্টকর'।

বিজ্ঞানী হিসাবে ল্যাবরেটোরির কাজকর্মের ধারা বজায় রেখে দেশসেবা চালিয়ে যেতে এবং লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতির অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তিনি একরকম সমঝোতাই করেছিলেন বলে মনে হয়।

এই সমঝোতা বোধগম্য। ইংরেজ জানতো যে কেমিক্যাল সোসাইটির (লন্ডন) প্রেসিডেন্টকে দিয়ে অনুরোধ করলে 'কাজ' হতে পারে, তাই তারা এই কৌশলী পথ নিয়েছিল। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রয়োজনে নিজেকে এভাবে যুক্ত হতে দেওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্রের মানসিক অশান্তি হয়েছিল মনে করা অসঙ্গত হবে না।

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে 'দেশের' সরকারকে সাহায্য করা - আর একদিক থেকে দেখলে 'নাগরিক' কর্তব্য। কিন্তু সরকার বিপথগামী হলে, ভুল করলে বা দেশের মানুষের ন্যায্য প্রতিবাদ ও দাবীর দমনে 'রাউলাট আইন' প্রয়োগ করলে গর্জে উঠতেও তিনি পিছ-পা হননি।

কিন্তু আমরা তাঁর উত্তরসূরিরা – রাউলাট আইনের চেয়েও ভয়ংকর কালাকানুন ইউ এ পি এ (আনলফুল অ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট) বা আফস্পা'র (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট) যা মণিপুরে সেনা-তান্ডব জারী রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে - আস্ফালনে নাগরিক কণ্ঠরোধে অবিচলিত থেকে ল্যাবরেটোরিতে মুখ গুঁজে মহান বিজ্ঞান ব্রতে লিপ্ত থাকতে পারি অম্লানবদনে 'জানি না তো' বলতে পারি এবং নিজ দক্ষতাকে বাজারী নিলামে তুলে বলতে পারি-আমি প্রফেশনাল, যে বেশী দাম দিতে পারবে আমি তার সেবাদাস, কাজটা দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কিনা তা দেখা আমার কাজ নয়। এই কি প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষার ফলশ্রুতি? তা যদি না-ই হবে তাহলে আজীবন প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবায় নিবেদিত-প্রাণ যে মানুষ, যে কাজের জন্য মানুষটির প্রাপ্য শ্রদ্ধা স্বীকৃতি সম্মান, সেই বিনায়ক সেন-কে কেন দেশ যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নিদান দেয়, শঙ্কর গুহ নিয়োগীকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়?

প্রফুল্লচন্দ্রকে অবশ্য আত্মগ্লানির হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে 'আচার্য' সম্বোধনে ভূষিত করে 'স্যার' এর বোঝা থেকে মুক্ত করেছিলেন তিনি। তিনি তো আচার্য-ই, জাতীয় শিক্ষক।

এগারো।। জলীয় দু-চার কথা

প্রফুল্লচন্দ্র-রা কি শুধু বিজ্ঞানের বা বিশেষ বিজ্ঞান-শাখার কর্মীদেরই, নাকি অন্য নেশা-পেশার মানুষের, আম জনতারও? নানাদিক থেকে এ প্রশ্নের আলোচনা করা যায়। কিন্তু একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জল নিয়ে আমরা এখন গভীর সংকটে। কোথাও কখনও জলের প্রচন্ড অভাব, পানীয় জলেরও। কোথাও বা আর্সেনিক, ফ্লোরাইড বা অন্য বিষদুষ্ট। জল ব্যবস্থাপনার অবৈজ্ঞানিক নীতি-পদ্ধতি আমাদের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। 'আত্মচরিতে' প্রফুল্লচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে যা লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয় - "হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে নিয়মিত পুষ্করিণী ও খাল কাটা হইত, বড় বড় বাঁধ দিয়া গ্রীষ্মকালের জন্য জল ধরিয়া রাখা হইত। কিন্তু বাংলায় বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলার স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই প্রথা লোপ পাইতেলাগিল .... যে জলসেচ প্রণালী বহু যত্নে কৌশলে ও দূরদর্শিতার সহিত প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইল"। এই প্রসঙ্গে আচার্য রায় গুরুসদয় দত্তের কথাও উল্লেখ করেছেন। "বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রূপে (তিনি) কতকগুলি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঐ জেলার কতকগুলি বাঁধ সংস্কার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে পুকুর বাঁধ প্রভৃতি জলসেচ প্রণালীর ধ্বংসের সহিত তাহার পল্লীধ্বংসের কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।... বাঁকুড়া আজ মরা পুকুরের দেশ। ... বাঁকুড়া জেলাতে আজ যে দারিদ্র্য, ব্যাধি, অজন্মা, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহা ঐ প্রাচীন জল-সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যাইবার প্রত্যক্ষ ফল।"

স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের 'The Restoration of Ancient Irrigation of Bengal থেকেও উদ্ধৃত করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র- "ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলত কৃষকদের মঙ্গলের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু উহার ফল অনিষ্টকর হইয়াছে ...পরম্পরাগত সহযোগিতার শক্তি উহাতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, জলসেচ ব্যবস্থা লুপ্ত এবং ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ....."

প্রফুল্লচন্দ্রের আক্ষেপ ছিল যে ভারত যেহেতু স্বাধীন ছিল না, তাই 'সাম্রাজ্যনীতির প্রভাব' মুক্ত হয়ে দেশবাসীর যথার্থ মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারেনি। উত্তরবঙ্গের বন্যাতেও তিনি 'সাম্রাজ্যনীতির প্রভাব' এর ফলে অপ্রশস্ত সেতুতে জলপ্রবাহ রোধ করে বন্যা ঘটানোর দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ

হয়েছিলেন, সেই সুদূর ১৯২০'র দশকে।

আজ আমরা স্বাধীন হয়ে ৬৪ বছর পার করেছি। কিন্তু 'সাম্রাজ্যনীতির প্রভাব' মুক্ত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পেরেছি কি? বাঁকুড়া জেলায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে গেছে প্রায় ১০ মিটার, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এখন আবার প্রায় খরার সম্মুখীন। রাজ্য সরকার তাও গভীর নলকূপের সাহায্যেই সেই অবস্থার মোকাবিলার পরিকল্পনা করেছে। জনৈক পত্রলেখক দৈনিক কাগজে লিখেছেন, 'আমরা কি অগভীর থেকে গভীর গভীরতর গভীরতম নলকূপের দিকে এগিয়ে চলেছি?' (পার্থ বিশ্বাসের পত্র, বর্তমান' ১১ই ডিসেম্বর, ২০১০)। আর উত্তরবঙ্গে আজও সেই একই অভিযোগ – সুপারিশ হয়তো ২৫০ মিটার লম্বা সেতু বানাবার, কিন্তু সেটা কিভাবে ৫০-৬০ মিটারের হয়ে যায়। প্রতিবছর বর্ষায় তা ভেসে যায়। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে মন্ত্রী আজও ধমকান, 'তোমরা কি সব ইঞ্জিনীয়ার?'

বারো।। স্থিতিশীল উন্নয়নের অগ্রদূত

আবারও বলি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন একটিমাত্র প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। ব্যক্তিবিশেষের একার কাজও নয় তা। এতদিন আমরা হয়তো তাঁকে পূজার্ঘ্য দিয়েছি, কিন্তু মূল্যায়ন করিনি, গ্রহণ করিনি। দেরীতে হলেও তা হওয়া জরুরী।

যেটুকু পর্যালোচনা করা গেল, তাতে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক তো ছিলেনই। কিন্তু সেসব ছাপিয়ে প্রোজ্জ্বল যে ভাবমূর্তি তা হল ঃ তিনি আমাদের আচার্য, আমাদের শিক্ষক, পথপ্রদর্শক, স্নেহময় অগ্রজ, যিনি তাঁর জীবনটাকেই উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য।

চেষ্টা করেও আমরা কেউ প্রফুল্লচন্দ্র হতে পারবো না। বহিরঙ্গে তাঁর জীবনযাত্রার অনুকরণও অর্থহীন। ১৫০ তম জন্মবর্ষে তাঁর মাহাত্ম্য-কীর্তনও হবে নিতান্তই আরও একবার পূজার মন্ত্রপাঠ। আসল প্রশ্ন হল স্বাধীনতার-উত্তর ভারতে তাঁর ভাবাদর্শ ও কর্মপন্থা কতটা প্রয়োজনীয় ছিল এবং তা আমরা গ্রহণ করেছি কি না, আজই বা তিনি কতখানি প্রাসঙ্গিক? প্রশ্নের প্রথমাংশের উত্তর এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে – মোটের উপর বলা যায় প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা এযাবৎ পরিহারই করেছি, যদিও তাঁর নাম-জপ করে গেছি ক্রমাগত। আর প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশের উত্তরে বলা যায়, প্রফুল্লচন্দ্র আজ আরও বেশী করে প্রাসঙ্গিক।

সময়ের দূরত্ব অনেকটা বেড়ে গেলেও এবং বাস্তব অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হলেও, এখনও যদি আমরা তাঁকে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও পদ্ধতির মর্মে স্থাপন করতে না পারি, তবে আমাদের দুর্ভোগ বহুগুণে বেড়েই যাবে।

আজকের দিনের উন্নয়ন ভাবনা, পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ "স্থিতিশীল-উন্নয়ন" (Sustainable Development) ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, কোথাও সঠিক ভাবে কোথাও বাগাড়ম্বরসহ। কেউই কিন্তু নীতিগতভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীটি অস্বীকার করছেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সার কথা হল – উন্নয়ন অবশ্যই বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করবে কিন্তু একই সঙ্গে তা অনাগত প্রজন্মের মানুষদের পরিবেশ-ভিত্তিটাকেও সুস্থ ও উৎপাদনশীল রাখবে। পরিবেশ সম্পৃক্ত এই উন্নয়ন-ভাবনায় স্বভাবতই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে স্থানীয় পরিবেশ, মানুষ, সমাজ, পরম্পরাগত সামাজিক জ্ঞান, পরিবেশের জ্ঞান। প্রফুল্লচন্দ্রের সমসময়ে কম্পিউটার ছিল না, পরিবেশ ও বাস্তুবিজ্ঞান প্রায় কিছুই বিকশিত হয় নি। কিন্তু তবুও মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর উদার-মমত্ব যেভাবে প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল আজকের দিনের নিরিখে তা ছিল স্থিতিশীল উন্নয়নেরই পথ। বেঙ্গল কেমিক্যাল শিল্পকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতিতে তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই অর্থে বলা যায় প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন।

আজ আমরা জানতে বুঝতে পারছি যে বিজ্ঞানের নীতি সূত্রাদি অভিন্ন ও আন্তর্জাতিক হলেও স্থান কাল পাত্র-ভেদে সেগুলির প্রয়োগরীতি পাল্টাতে হয়, নাহলে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল বিষময় হতেই পারে, বুঝছি যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে এদেশের সামগ্রিক কল্যাণে ও উন্নয়নে লাগাতে গেলে এদেশের জলহাওয়া, সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ধান, গম, তুলা, তৈলবীজ, বেগুন – এসবের জিন বদলানোর উদ্যোগের পাশাপাশিই শুরু হয়েছে আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি স্বকীয়তা ও অস্তিত্বের জিন কারিকুরির উদ্যোগ। এসবের কতটা কি গ্রহনীয় বা কতটা অগ্রহনীয় তা বিচার করতে হবে এদেশের বিজ্ঞানীদেরই।

আর এ কাজ মূলত আমাদেরই করতে হবে, আমাদের হয়ে একাজ অন্য কেউ করে দিতে পারে না, মুনাফাসন্ধানী বহুজাতিকরা তো নয়ই।

তবুও যদি আমরা প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর মত পূর্বসূরীদের ইচ্ছা আবেগ ও পথনির্দেশ ভুলে থাকি, আমাদের শিক্ষা, গবেষণা, শিল্প ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মর্মে স্থান দিতে না চাই তবে আমরা আত্মহত্যার পথই বেছে নেবো। উত্তরপ্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে, এ যদি সত্য হয়, তাহলে এও মানতে হবে যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপনিষদকে গড়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান-অবহিত রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর উপনিষদের মধ্যে নতুন নতুন অর্থের সন্ধান করেছেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য কিংবা অদ্বৈতবাদ-বিরোধী দেবেন্দ্রনাথ, কারো সঙ্গেই তাঁর সেসব ব্যাখ্যার মিল নেই, তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব। এ বিষয়ে অন্যত্র কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি,[২] উৎসাহী পাঠক ইচ্ছে করলে সেগুলো পড়তে পারেন।

দেবেন্দ্রনাথ একদা বেদ-বেদান্তকে চির-অভ্রান্ত ঐশ্বরিক সত্য বলে মানতেন। সেই ভ্রান্তিপথ থেকে তাঁকে সরিয়ে এনেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। যেন তারই ধারাবাহিকতায়, নিজের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রণোদনায়, রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থানে পৌঁছেছিলেন যে উপনিষদগুলি কোনো লোকাতীত ('অপৌরুষেয়') শাস্ত্রবচন নয়, বিশেষ বিশেষ দেশকাল ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ বলেই তারা মূল্যবান। উপনিষদ-সাহিত্যকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেখে, একটা বিশেষ দেশকালের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির ফসল হিসেবে বিচার করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৯২৪ সালে রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত *The Principal Upanishads*- এর পরিশিষ্টে এক প্রবন্ধে লিখছেন, '... এতে যেসব শব্দ রয়েছে তারা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত সেকালের জনগণের জীবনের অনুষঙ্গে, যারা ঐ ভাষায় কথা বলত। সেই প্রাণস্পন্দিত পরিমণ্ডল থেকে বিযুক্ত হওয়ায় এই মহান রচনাগুলির ভাষার এক বিশাল অংশ তাদের ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোটুকুই কেবল আমাদের সামনে মেলে ধরে, কিন্তু ফুটিয়ে তুলতে পারে না জীবনের সেইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা যার ইশারার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয় অনির্বচনীয় যা কিছু।' ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চেয়ে তাঁর কবিমন ঐ 'ইশারা'গুলোকেই আবিষ্কার করতে চাইল বেশি করে: 'উপনিষদগুলি দাঁড়িয়ে আছে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের ওপরে নয়, আত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর। আর জীবন তো মতের মধ্যে আবদ্ধ নয়, পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শক্তি এসে মেলে তার মধ্যে — অদ্বৈতবাদী ভাবনা আর দ্বৈতবাদী ভাবনা, সসীম ভাবনা আর অসীম ভাবনা একে অপরকে বাতিল করে দেয় না।' উপনিষদ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইশারাগুলো সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ঐ ইশারাগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন সব সংকেত যা অবিশ্লেষ্য, যাদের ব্যাখ্যা নিহিত আছে কেবল যে-জনগণ ওগুলোকে ব্যবহার করত তাদের সজীব হৃদয়ের গভীরে। ... সকল কবিতাই এ ধরনের শব্দে পূর্ণ থাকে আর সেইজন্যেই এক ভাষার কবিতা কখনো অন্য ভাষায় ঠিকমতো অনুবাদ করা যায় না। ...'[৩] কিট্‌স-এর 'Ode to a Nightingale'-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বোঝান, ঐ কবিতার ইংরেজি শব্দগুলোর জায়গায় নিছক ভাষাতাত্ত্বিক সাযুজ্যযুক্ত বাংলা শব্দ বসালেই তা কখনো সুখপাঠ্য বাংলা কাব্যানুবাদ হতে পারে না। কবিতার এই উপমাটি আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় যে তিনি উপনিষদকে ধরাবাঁধা ধর্মতত্ত্বের বদলে সৃজনাত্মক পদ্ধতিতে পাঠ

তিনি বস্তুবাদী নন, ... কিন্তু বস্তুবাদের যুক্তিধারাকে পাষণ্ডদের শয়তানী বলে উড়িয়ে দেন না। তাঁর ভাববাদ এক বিশেষ ধরনের ভাববাদ। ...

রবীন্দ্রনাথ : এক বিশেষ ধরনের ভাববাদ

আশীষ লাহিড়ী

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে, এ যদি সত্য হয়, তাহলে এও মানতে হবে যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপনিষদকে গড়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞান-অবহিত রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর উপনিষদের মধ্যে নতুন নতুন অর্থের সন্ধান করেছেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য কিংবা অদ্বৈতবাদ-বিরোধী দেবেন্দ্রনাথ, কারো সঙ্গেই তাঁর সেসব ব্যাখ্যার মিল নেই, তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব। এ বিষয়ে অন্যত্র কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি,[১] উৎসাহী পাঠক ইচ্ছে করলে সেগুলো পড়তে পারেন।

দেবেন্দ্রনাথ একদা বেদ-বেদান্তকে চির-অভ্রান্ত ঐশ্বরিক সত্য বলে মানতেন। সেই ভ্রান্তিপথ থেকে তাঁকে সরিয়ে এনেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। যেন তারই ধারাবাহিকতায়, নিজের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রণোদনায়, রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থানে পৌঁছেছিলেন যে উপনিষদগুলি কোনো লোকাতীত ('অপৌরুষেয়') শাস্ত্রবচন নয়, বিশেষ বিশেষ দেশকাল ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মানুষের উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ বলেই তারা মূল্যবান। উপনিষদ-সাহিত্যকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রেখে, একটা বিশেষ দেশকালের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির ফসল হিসেবে বিচার করতে পেরেছিলেন তিনি। ১৯২৪ সালে রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত *The Principal Upanishads*- এর পরিশিষ্টে এক প্রবন্ধে লিখছেন, '... এতে যেসব শব্দ রয়েছে তারা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত সেকালের জনগণের জীবনের অনুষঙ্গে, যারা ঐ ভাষায় কথা বলত। সেই প্রাণস্পন্দিত পরিমণ্ডল থেকে বিযুক্ত হওয়ায় এই মহান রচনাগুলির ভাষার এক বিশাল অংশ তাদের ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোটুকুই কেবল আমাদের সামনে মেলে ধরে, কিন্তু ফুটিয়ে তুলতে পারে না জীবনের সেইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা যার ইশারার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয় অনির্বচনীয় যা কিছু।' ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের চেয়ে তাঁর কবিমন ঐ 'ইশারা'গুলোকেই আবিষ্কার করতে চাইল বেশি করে: 'উপনিষদগুলি দাঁড়িয়ে আছে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতর্কের ওপরে নয়, আত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর। আর জীবন তো মতের মধ্যে আবদ্ধ নয়; পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শক্তি এসে মেলে তার মধ্যে -- অদ্বৈতবাদী ভাবনা আর দ্বৈতবাদী ভাবনা, সসীম ভাবনা আর অসীম ভাবনা একে অপরকে বাতিল করে দেয় না।' উপনিষদ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইশারাগুলো সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ঐ ইশারাগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন সব সংকেত যা অবিশ্লেষ্য, যাদের ব্যাখ্যা নিহিত আছে কেবল যে-জনগণ ওগুলোকে ব্যবহার করত তাদের সজীব হৃদয়ের গভীরে। ... সকল কবিতাই এ ধরনের শব্দে পূর্ণ থাকে আর সেইজন্যেই এক ভাষার কবিতা কখনো অন্য ভাষায় ঠিকমতো অনুবাদ করা যায় না। ...'[২] কিট্‌স-এর 'Ode to a Nightingale'-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বোঝান, ঐ কবিতার ইংরেজি শব্দগুলোর জায়গায় নিছক ভাষাতাত্ত্বিক সাযুজ্যযুক্ত বাংলা শব্দ বসালেই তা কখনো সুখপাঠ্য বাংলা কাব্যানুবাদ হতে পারে না। কবিতার এই উপমাটি আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় যে তিনি উপনিষদকে ধরাবাঁধা ধর্মতত্ত্বের বদলে সৃজনাত্মক পদ্ধতিতে পাঠ

তিনি বস্তুবাদী নন, ... কিন্তু বস্তুবাদের যুক্তিধারাকে পাষণ্ডদের শয়তানী বলে উড়িয়ে দেন না। তাঁর ভাববাদ এক বিশেষ ধরণের ভাববাদ। ...

করার পক্ষপাতী আর সেই কারণেই একদিকে যেমন বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর একান্ত আপন, ব্যক্তিগত, সংশয়বাদী, ধর্মতত্ত্ব-বিরহিত উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে পারলেন, তেমনি একই সঙ্গে নব্য বিজ্ঞানের সঙ্গেও ভাববিনিময় করতে পারলেন। বিশ্বের বাস্তবতা সম্বন্ধে এই ধর্মতত্ত্ব-বিরহিত খোলা দৃষ্টিভঙ্গিকে বলতে চাই 'মহাজাগতিক সংশয়বাদ।'

এক বিশেষ ধরনের ভাববাদ *

রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যাখ্যাতীত ব্রহ্মও সত্য, ঐহিক জগৎও সত্য। ব্রহ্মকে সত্য বলে মানেন বলে জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলে অস্বীকার করেন না তিনি। অন্য কথায়, আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-জ্ঞান আহরণ করে তাকে তিনি অস্বীকার করছেন না। সে-জ্ঞান পরম না হতে পারে, সম্পূর্ণ না হতে পারে, কিন্তু অসত্য নয়, মায়া নয়. মায়াবাদী দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুস্পষ্ট বিরাগ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন। সে-মতকে ভারতের ঔপনিষদিক সত্যসাধনা থেকে এক বিচ্যুতি বলে বর্ণনা করে বলেছেন, ঐ বিচ্যুতির মাশুল ভারত দিয়ে চলেছে — 'ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।' [৪] কিন্তু '... এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়।' [৫] কেননা '... সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের বদলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো —সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক [অর্থাৎ উত্তর-শঙ্কর] কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।' [৬] আবার, তিনি যে সরাসরি দ্বৈতবাদী তাও কিন্তু নয়। কেননা, তাঁর মতে 'অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়ে বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়। সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে, বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর এক দিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।' [৭]

তিনি বস্তুবাদী নন, তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু বস্তুবাদের যুক্তিধারাকে পাষণ্ডদের শয়তানি বলে উড়িয়ে দেন না। তাঁর ভাববাদ এক বিশেষ ধরনের ভাববাদ। আশৈশব অভ্যাসবশত তিনি অবশ্যই বৈদান্তিক, কিন্তু ঘোর মায়াবাদ-বিরোধী। তবে কি তিনি দ্বৈতবাদী? না, দ্বৈতবাদকেও তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন না। অপরদিকে অদ্বৈতবাদকে বাস্তববিমুখ বলে সমালোচনা করলেও, তার যুক্তিধারার সূক্ষ্মজটিল কারুকার্য, তার চিন্তাপরিধির বিরাটত্বকে অস্বীকার করেন না। অদ্বৈতবাদ-দ্বৈতবাদ নিয়ে বিতর্ক তাঁর মতে ক্ষতিকর ও নেতিবাচক, কেননা তা মানুষকে সত্যসন্ধানের পথে এগিয়ে দেয় না। স্পষ্টতই, সত্যসন্ধান বলতে তিনি এমন একটা কিছু বোঝেন যা ঐহিক জগতের নিয়মকানুন বুঝতে সাহায্য করে, আবার সেই বোঝার মধ্যে দিয়েই পূর্ণসত্যকে — সেটা যাই হোক — উপলব্ধি করার পথে এগিয়ে দেয়।

১৯২৮ সালে রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন তিনি: 'জগদীশ আজ বিশ্বকে যা দিচ্ছেন তার মধ্যে ভারতের চিত্ত আছে, কিন্তু তার উদ্বোধন য়ুরোপের। তিনি যদি কূপমণ্ডূক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্যদর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েছে।' [৮] তিনটি জিনিস

এখানে লক্ষণীয়। প্রথমত, 'ভারতের চিত্ত' বলতে তিনি শুধুই আধ্যাত্মিকতা বোঝাচ্ছেন না। বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক ভাবনার দিক থেকেও সভ্যতার ভাণ্ডারে আধুনিক ভারতের যে নতুন কিছু দেবার আছে, সেই স্বীকৃতি রয়েছে এখানে। দ্বিতীয়ত, সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে-ভাষায় এখানে মত প্রকাশ করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, মননগত স্তরে, অন্তত জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি বিদ্যাসাগর-অক্ষয় পথেরই পথিক। সাংখ্য প্রভৃতি যেসব দর্শন নিছক বুদ্ধির চর্চায় সীমাবদ্ধ, যারা প্রতিনিয়ত বুদ্ধিজাত ধারণাকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে নেওয়ার কথা বলে না, তাদের দিন ফুরিয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। কথাটা আরো উল্লেখ্য এই কারণে যে জগদীশচন্দ্র ছিলেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার যন্ত্র উদ্ভাবনে সিদ্ধহস্ত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববুদ্ধির সঙ্গে প্রাচীন ঋষিদের বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সাযুজ্যসন্ধানের বদলে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপ্রতিভার এই মিলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন রবীন্দ্রনাথ।

পরিমল গোস্বামীর কথায়, "যখন তিনি বলেন, 'জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান' (নিষ্ফল আত্মা, ১৮৮৫) তখন মনে হবে তিনি বস্তুবাদী। মনে হলে ভুল হবে না, যদিও প্রচলিত অর্থে তিনি বস্তুবাদী নন। তিনি প্রচলিত অর্থে ভাববাদী নন, অথচ তিনি ভাববাদী। কোনো একটিমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে জানা যাবে না, কেননা তাঁর মনে সম্ভবতঃ স্পেশালাইজেশনের কোনো স্থান ছিল না। মূলতঃ তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, এবং তাঁর চিন্তাধারা যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত, এবং তাঁর যুক্তির শেষ লক্ষ্য সৃষ্টির আনন্দে অবগাহন — তা সে বিশ্বসৃষ্টির বিস্ময়জনিত আনন্দেই হোক, বা আপন সৃষ্টির আনন্দেই হোক।" [৯]

ভগবদ্‌গীতা: 'তর্কচাতুরী'

ভগবদ্গীতা নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার মধ্যেও অদ্ভুত একটা 'টানাটানি' লক্ষ্য করি। গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কতখানি অস্বস্তি ছিল, তার খুব স্পষ্ট বিবরণ পাই ৩১ মে ১৯০৮ সালে অজিতকুমারকে চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠি থেকে। [১০]

প্রসঙ্গটি তিনি উত্থাপন করছেন এই ভাবে: 'গীতা সম্বন্ধে তুমি যা বলেচ — সেটা চিন্তা করে দেখবার বিষয়।' গীতা নিয়ে অজিতকুমার কী বলেছিলেন, সেটা অবশ্য আমরা জানতে পারি না, কারণ তাঁর সেই চিঠিখানি পাওয়া যায়নি যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'গীতার *ঠিক ইতিহাসটি* (বাঁকা হরফ আমার -আ.লা.) পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালির মীমাংসা করা যেত।' হেঁয়ালিটা কীসের? 'গীতার মধ্যে কোনো একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে, তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে — কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটা সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যেরকমটি হয় গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে।' তিনি স্পষ্টই বলেন, 'অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতো করে এই টানাটানির একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও দেবার চেষ্টা করেছেন: 'আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল — যখন অহিংসা ধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল তখন কোনো একজন মনস্বী, পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে

থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব *উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী* খানিকটা না মিশে পারেনি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত তাহলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।'

বেশ কঠিন কিছু কথা এখানে বললেন রবীন্দ্রনাথ। গীতার মধ্যে একটা 'হেঁয়ালি' আছে। বড়ো আদর্শকে 'সঙ্কীর্ণ' কাজে লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। কালাতীত শাশ্বত রচনা নয় গীতা, এক *উৎকট সাময়িক প্রয়োজনে* লিখিত। স্বভাবতই, মহৎ সত্য বা রীতি নয়, *তর্কচাতুরী* এসে তার মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, গীতার যা প্রাণ, সেই আত্মার অবিনশ্বরত্ব-তত্ত্ব সম্পর্কিত উপদেশ নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তিনি, বললেন, যেভাবে ওটার প্রয়োগ করা হয়েছে, তার মধ্যে 'বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই।' অর্থাৎ ওটা সাময়িক কার্যসিদ্ধির কৌশল মাত্র — এ কোন রবীন্দ্রনাথ ?

তিনি অকপটে লেখেন, 'আমাকে লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে আমি আজ পর্যন্ত [১৯০৯] গীতা ভাল করে তলিয়ে পড়ি নি — দুতিনবার আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু বাধা পেয়ে শেষ করতে পারিনি।' বাধা পেয়েছিলেন ওর সুবিধাবাদী তর্কচাতুরীর দেওয়ালেই।

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তর নাম করেননি, কিন্তু এরকম খুবই সম্ভব যে তিনি দত্ত মহাশয়ের *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের* দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৮৩) উপক্রমণিকার এই তীক্ষ্ণ মন্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন: 'মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণ-প্রধান ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতর যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে একখানি পরমার্থ-প্রধান সঙ্কলিত দর্শন-শাস্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃত, "হাটের মাঝে ব্রহ্মজ্ঞান"। ঐ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নর-হত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই।' [১১]

প্রসঙ্গত অবধারিতভাবেই মনে পড়ে যায় ১৯৬২ সালে প্রকাশিত দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বীর 'ভগবদ্গীতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকসমূহ' ('Social and Economic Aspects of the Bhagavad-Gita') প্রবন্ধটির কথা। কোসাম্বী স্বভাবসুলভ উদ্ধত ভাষায় যা লিখেছিলেন তার মর্মার্থ, এমনকি ভাষার্থও, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের চেয়ে খুব বেশি আলাদা নয়: 'স্থূলভাবে বলতে গেলে, গীতার উপযোগিতার মূলে আছে তার এক অদ্ভুত মৌলিক ত্রুটি। সেটি হল, যাদের মেলানো যায় না তাদের যেন মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই ভাব উৎপাদনে তার চাতুর্য। মহান ঈশ্বর বারবার অহিংসানীতির মহত্ত্বের ওপর জোর দেন, অথচ গোটা আলোচনাটাই হল যুদ্ধের প্রণোদনা।' [১২] রবীন্দ্রনাথ যেটাকে 'তর্কচাতুরী' বলছেন, কোসাম্বী সেটাকেই কি *dexterity* in seeming to reconcile the irreconcilable বলছেন না ? 'অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই' — এই বাক্যটির সঙ্গে কোসাম্বীর উদ্ধৃত অংশের শেষ বাক্যটির মেজাজের মিল চোখে পড়ার মতো। কোসাম্বী যেটাকে পিচ্ছিল সুবিধাবাদ ('slippery opportunism') বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেইটাকেই কি 'টানাটানি' বলছেন না ?

গীতা সম্বন্ধে কোসাম্বীর বিশ্লেষণ মার্ক্সবাদী হঠকারিতার নিদর্শন হিসেবে বহু-নিন্দিত, কিন্তু আটচল্লিশ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথের ঐ গীতা-নিন্দা পণ্ডিতমহলে বিশেষ উল্লেখিতই নয়, নিন্দিত হওয়া তো পরের কথা। প্রশান্তকুমার পাল অবশ্য *রবিজীবনীতে* এই চিঠিখানি নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারেই আলোচনা করে গেছেন।

তবে রবীন্দ্রনাথের মূলস্রোতে ফেরার সূত্রও

ঐ পত্রাবলীর মধ্যে থেকেই পেয়ে যাই আমরা। উদ্ধৃত চিঠিখানির ঠিক দু বছর পরে, ১৯১০ সালের ২৩ মে তিনধরিয়া থেকে লিখছেন তিনি: ‘ভগবদ্‌গীতা আমার খুব কাজে [১৩] লাগ্‌চে। এতকাল এত হুজুগের মধ্যেও আমি গীতা পড়িনি — কারণ তখন আমার পড়ার সময় হয়নি, এখন সময় বুঝেই সময়ের কর্ত্তা আমার হাতে এই বইখানি তুলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে যোগযুক্ত হবার জন্যে মনকে যে একটি অতি গভীর শান্তি ও সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তার সত্যতা বুঝতে পারচি। ... এই যে সামঞ্জস্য এ ত বাইরের জিনিষ নয় — নিজের অন্তরের মধ্যে *সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত* লোকে অধিরোহণ করতে হবে — *ভিতরকার সমস্ত বিরোধ* নিঃশেষে না মেটালে নয়, এই জন্যেই বাইরের বাধার দ্বারা পদে পদে তার পরীক্ষার প্রয়োজন হচ্চে। ঈশ্বর কবে এই পরীক্ষা থেকে আমাকে উত্তীর্ণ করবেন ? কবে তিনি আমার সমস্ত ভাঙাকে জোড়া দিয়ে নেবেন ?’ আগের চিঠির কণ্ঠস্বর আমাদের চেনা নয় ; এ চিঠির কণ্ঠস্বর আমাদের খুব চেনা। এই দোলাচলও।

আধ্যাত্মিকতা ও সংশয়বাদ

আধ্যাত্মিক মুক্তি মানে সমস্ত দোলাচলের অবসান। যখনই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে মানুষের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যচেতনাকে ব্যাখ্যা করা হয়, বলা হয় ঈশ্বর সবকিছুকেই আগে থেকে ‘প্রোগ্রাম’ করে রেখেছেন, তখনই মানুষের মন *সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত* লোকে অধিরোহণ করে, প্রশ্নহীন সংশয়হীনতায় মজে শান্তি লাভ করে। যখনই আমরা বলি, সর্বশক্তিমান কেউ একজন বা কোনো একটা কিছু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই (বা তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম মেনে) জল পড়ে, পাতা নড়ে, তখনই আমরা আমাদের প্রশ্নকে একটা পূর্বনির্মিত সমাধানের খোপে ফেলে দিই। তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে আলোড়িত হবার অধিকার হারাই ; ব্যাপ্ত বিস্ময়ে, সংশয়ের ঠেলায় বিচলিত হবার সুযোগ রাখি না। কেউ কেউ মনে করেন, এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া এই ধরনের সংশয়হীন মুক্তি অর্জন করা যায় না।

বিশ্বাসী মানুষের — এমনকি বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর — কাছেও সংশয় আর সংশয়হীনতার এ দ্বন্দ্ব পীড়াদায়ক। ডারউইনের একটি চিঠিতে এই দ্বন্দ্বটি চমৎকার ফুটে উঠেছে: ‘নিরীশ্বরবাদীদের মতো করে লেখবার কোনো বাসনা আমার ছিল না। কিন্তু একথা স্বীকার করব যে অন্যেরা যেমন অনায়াসেই চতুর্দিকে পূর্ব-পরিকল্পনা আর মঙ্গলময়তার সাক্ষ্য খুঁজে পান, আমিও তা দেখতে চাই, কিন্তু পাই না ... বিশ্ব যেন বড়ো বেশি দুর্গত বলে মনে হয়। আমি কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারি না যে একজন মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেন এমনভাবে পরিকল্পনা করবেন যাতে ... বেড়ালরা ইঁদুরদের নিয়ে খেলা করবে ?’ [১৪]

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে এই বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে বিশ্বে এই অপূর্ণতা কেন, এত অমঙ্গল কেন — এই নৈতিক প্রশ্ন ব্যাকুল করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও। চেঙ্গিজ্ খাঁ এতগুলি নিরীহ মানুষকে পৈশাচিক সুখে কোতল করলেন, "এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোনো উপকার হল না।’ উত্তরে ঠিক বিপরীত কথা বলেন বিশ্বাসী শ্রীরামকৃষ্ণ : ‘ঈশ্বরের কার্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করছেন ? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই করছেন। তিনি কেন সংহার করছেন আমরা কি বুঝতে পারি ? আমি বলি, মা, আমার বোঝবারও দরকার নেই, তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও।’ [১৫] সংশয়ের ঠেলা থেকে মুক্তি লাভের ঐ পথ — ভক্তি, নিঃসংশয় আত্মনিবেদন।

নির্ভীক অন্-আধ্যাত্মিক সংশয়বাদ, আমাদের দেশে আধুনিক কালে বিদ্যাসাগর আর অক্ষয়কুমার দত্ত যার প্রধান উদ্‌গাতা, তার পূর্ণ উদ্ভাস আমরা রবীন্দ্রনাথে পাই না। তাঁর মধ্যে যা পাই তা মূলত এক বিস্ময়বোধ, যা কখনো আনন্দবিহ্বল, কখনো বেদনাহত। বস্তুত, ঐ নির্ভীক সংশয়বাদের অভাবেই রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই প্রশ্ন-থামানো আধ্যাত্মিকতার জগতে, *সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত লোকে*, চলে যাবার বাসনা ব্যক্ত করেন। সেখান থেকে তাঁকে বারে বারে ফিরিয়ে আনে অবশ্য তাঁর ঐ জগৎঘনিষ্ঠ বিস্ময়বোধই। যখন তিনি বলেন, পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে? — তখন তিনি আসলে এই কথাই বলেন যে পথের শেষ খুঁজে পাওয়ার চেয়েও বেশি রোমা'কর হল 'হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা'র 'নিরুদ্দেশে' ভেসে চলবার অভিজ্ঞতা, এমনকি 'মরীচিকা অন্বেষণে' রত হবার অভিজ্ঞতা। চলতে চলতে, হোঁচট খেতে খেতে, একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানা, সেই সঙ্গে 'আপনাকে' জানা, ভুল জানা, ভুল শোধরানো, এক পা এগিয়ে তিন পা পেছোনো, তারপর একসঙ্গে পাঁচ পা লাফানো — এটাই তো মানুষের এগোবার পথ। এই পথটাতে বেড়া তুলে দিলে মানুষ 'মানুষের ধর্ম' থেকে বিচ্যুত হবে। তাই তাঁর 'পথ *চাওয়াতেই* আনন্দ,' তাই 'পথে চলাই সেই তো *তোমায়* পাওয়া।' তাই 'যার পরানে ... *তোমার* হাওয়া' লাগে, সে 'বিপদ বাধা কিছুই ডরে না', সে 'রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে', এমনকি ভীরুর মতো কেবল নিশ্চয়তার তীর ঘেঁষে ঘেঁষে সাবধানী তরী বায় না সে — সংশয়ের মাঝদরিয়ায় 'তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে।'

এই পান্থজনের সখার, এই 'তুমি'র দুটো তাৎপর্য। এক, নিরন্তর সংশয়মথিত অনুসন্ধানের রূপকল্প। দুই, ঈশ্বরে নিষ্কম্প, সংশয়হীন বিশ্বাস পরিণত রবীন্দ্রনাথের সেই ঈশ্বর কোনো শাস্ত্রের ঈশ্বর নন, তিনি কবির একান্ত নিজেরই ঈশ্বর, যিনি ত্রিভুবনেশ্বর হয়েও কবির প্রেমের কাঙাল : 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে, নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে' ; তারই নয়ন কবিকে 'বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে।' যে-সংশয় থেকে কোনো নিস্তার নেই, অথচ যে-সংশয়কে তিনি তাঁর ধর্মীয় ও পারিপার্শ্বিক সংস্কারগত বিশ্বাস হেতু মেনে নিতে পারছেন না, তারই মোকাবিলা করার জন্য তাঁর ঐ আত্মিক বোঝাপড়া।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এই দুই বিপরীত মেরুতে সমান বিক্রমে রাজত্ব করেন। তাঁর সংশয় যেখানে ঘুমন্ত, তাঁর বিস্ময় সেখানেও জাগরূক। কখনোই বিস্ময়হীনতার কৃষ্ণ গহ্বরে পড়েন না তিনি, কদাচিৎ শিকার হন 'বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগে'র। তাঁর সখার প্রেমে আঘাত আছে, অবহেলা নেই। তাই মানুষের সংশয়-দীর্ণ জগতে ফিরে আসার পথ সব সময়েই খোলা রাখতে পারেন। বলতে পারেন, প্রথম দিনের সূর্যের মতো শেষ দিনের সূর্যও 'কে তুমি?' এই প্রশ্নের উত্তর জানতে পারেনি। জীবনের শেষ কবিতাটিতে, চৈতন্যের অর্ধ-নিমীলিত গহন থেকে যে-বাণী উঠে এসেছিল তাতেও একদিকে বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ সৃষ্টির পথ, অন্যদিকে চিরস্বচ্ছ অন্তরের পথের দ্বন্দ্ব প্রকট। এমনকি এত বড়ো আশ্চর্য উচ্চারণও সেখানে ঠাঁই পেয়েছে যে

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ, আর সে-ছলনা সইতে পরে বলেই, বৈপরীত্যকে আত্মস্থ করে চলতে পারে পারে বলেই মহৎ, মহৎ — মানুষের এই অহংকার নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাজনীতিতে হিংসা ও অহিংসা

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

[বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাজনীতির পুনর্বিবেচনা। দেখানো হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী অত্যাচারের প্রতিবাদে / নিরসনে ভায়োলেন্স পছন্দ না হলেও অস্বাভাবিক নয়। ভায়োলেন্ট প্রতিবাদ স্বাভাবিক, মানবিকতা ও বীর্যের প্রতীক। অহিংসা হিংসার বিপরীত হতে পারে না। মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ আর বিপ্লবোত্তর সমাজতন্ত্রের স্বর্গসুখ একইরকম কল্পকথা। দার্শনিক ভ্রান্তির ফলাফল অপপ্রযুক্ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষতির থেকেও অনেক মারাত্মক। দর্শনের ভ্রান্তির মূলে কাজ করে অনুসৃত যুক্তি-বিজ্ঞানের অপূর্ণতা ও মনস্তাত্ত্বিক "বায়াসের" অসচেতন প্রভাব। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শক্তির মূলে আছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গণিতের সফল প্রয়োগ যা মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে নেই। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমতাপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের বহুজাতিক গণতন্ত্রই বাস্তবোচিত ও কাম্য। টি এস ইলিয়ট ও অমর্ত্য সেনের চিন্তা এখানে প্রাসঙ্গিক।]

পর্ব এক

হিংসা ও সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক উদ্বেগজনক ব্যাপকতা

সংবাদ মাধ্যম মারফৎ আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে ভারতে আজ হিংসা, সন্ত্রাস, দমন-পীড়ন ক্রমশঃ বিস্তারিত হয়ে চলেছে। বহু অমূল্য জীবন বিনষ্ট হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে বিপুল ধনসম্পত্তি, শত শত কোটি টাকা পুলিশ মিলিটারির জন্য খরচ করা হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ও কর্ম এবং ব্যাহত হচ্ছে উন্নয়ন। উদ্বেগের সঙ্গে আমরা শুনলাম প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং বলছেন রাষ্ট্রই সার্বভৌম, জনগণকে রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলতে হবে। এমন কথা পূর্ববর্তী কোন প্রধানমন্ত্রী বলেননি। এ কি আগামী কোন অশুভের ইঙ্গিত? গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম, রাষ্ট্র নয়। ১৯৭০ এর দশকের দুঃস্বপ্ন এখনো আমাদের মনে পরিস্কার। জরুরী অবস্থা জারী এবং রাষ্ট্রক্ষমতার সার্বিক কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা সংবিধানেই দেওয়া আছে। বর্তমানে সেজ আইন, মাইনস্ অ্যান্ড মিনারেলস্ (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট, অপারেশন গ্রীণ হান্ট ইত্যাদি উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

দর্শনের পরীক্ষাগার (মানব সমাজ মানস) স্থান ও কালের মাপে বিরাট। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কঠিন এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বিশাল। ...

এখন পর্যন্ত স্বল্প হলেও কিছুটা গণতান্ত্রিক অধিকার, সুযোগ সুবিধা আমরা ভোগ করছিলাম। তা আর কতদিন থাকবে তা নিয়ে দুর্ভাবনা অমূলক নয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার, আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে আমাদের ভাগ্য ভিন্নতর নাও হতে পারে। আজ পর্যন্ত ভারত অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক থাকার সম্ভাব্য কারণ হল— ভোটাধিকার, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা ও স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম। ভারতের অখণ্ডতা, নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার থাকা, সামরিক একনায়কতন্ত্র না হবার কারণ মনে হয় — ভারতের বিরাট ভূখণ্ড ও সংবিধানের সামান্য প্রগতিশীলতা। এতবড় দেশে সামরিক অভ্যুত্থান কঠিন। আর সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকার মত ভারতে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি তথাপি আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত অভাবিত ঘটনা কখনো ঘটেই যায়। সদা জাগ্রত চিরন্তন প্রহরাই হল গণতন্ত্র রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি। Pen is mightier than sword কথাটি যথার্থ এবং তার তাৎপর্য গভীর।

ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিকে বিজ্ঞান বলা অনুচিত। কারণ ঐ সব বিষয়গুলির কাজকর্ম জড়বস্তু নিয়ে নয়, বুদ্ধি ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে। পদার্থ, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতির মত অতি সরলীকরণ (reductionism) করে তার মধ্য থেকে সূত্র বা 'ল' আবিস্কার সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আইনস্টাইনের Why Socialism (Monthly Review, May, 1949) প্রবন্ধটি পঠিতব্য। আর বিজ্ঞান প্রযুক্তি যেহেতু সমাজেই হয়, সমাজের লোকেদের দ্বারা, লোকেদের জন্য, তাই সমাজ বিজ্ঞান এই শব্দই ব্যবহার করতে হবে কারণ এটি বহুল প্রচলিত হয়ে গেছে এবং এর ভাল বিকল্প প্রতিশব্দ জানা নাই। বড় মুস্কিল হচ্ছে এই সব আলোচনা অত্যন্ত বিতর্কমূলক যা অনন্তকাল চলতে পারে। আর আবেগ জড়িত থাকায় এইসব আলোচনা নির্লিপ্ত হয়ই না প্রায়ই, উত্তাপ উৎপাদন বেশী, আলো কম। তবে একটা শুরু তো করা দরকার। আর তাছাড়া একশো সওয়া শো বছর আগেও বিজ্ঞানকে তো ন্যাচারাল ফিলজফিই বলা হত।

রাজা-প্রজা বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চিরন্তন ও স্বাভাবিক

অতীতের বহু মহান ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সমাজ রাজনৈতিক কর্মীদের আন্তরিক বহু প্রয়াস সত্ত্বেও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে উন্নতির নীতি সমূহ অদ্যাপি কার্যকরী হয় নাই। অতীতের কোন সময়ই যুদ্ধবিহীন ছিল না। বিগত পাঁচ হাজার বছরে গড়ে বছরে প্রায় সাড়ে তিনটে করে যুদ্ধ হয়েছে, ছোটখাট যুদ্ধ আজও বহু জায়গায় ঘটে চলেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধান্তে লীগ অফ নেশনস ও ইউনাইটেড নেশনস এর মহান সিদ্ধান্ত ও অঙ্গীকার সমূহের পরও যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে আবার শুরু হয়েছে নূতনতর সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি যা আজ ক্রমবর্ধমান। রাষ্ট্রসমূহও সে সবের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর সব ব্যবস্থাদি নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কা সরকার এল টি টি ই- কে সেদিন যা করল, মধ্য ও পূর্বভারতে মাওবাদী ও সন্ত্রাসবাদী দমনের নামে আদিবাসীদের উপর যা নির্যাতন চলছে, কাশ্মীরে, উত্তর-পূর্ব ভারতে যা চলছে তা, তা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। এ সব চলছে। চলবেই, এটাই কি সার কথা, শেষ কথা? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়া, চিনা বিপ্লব থেকে ভিয়েতনাম, ইরাক, আফগানিস্তান সর্বত্র অনুরূপ ব্যাপার সমূহ লক্ষ্য করা যায়।এ সব থেকে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি হলেও হিংসা ও সন্ত্রাসের রূপভেদ হচ্ছে মাত্র, বন্ধ তো হচ্ছে না, কমছেও না। কিন্তু আলাপ-আলোচনা, দেওয়া-নেওয়া, সহযোগীতা সহাবস্থানের মাধ্যমে বিরোধের অনেকটাই মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব, উচিতও। তবে আলেকজান্ডার,   চেঙ্গিস খান, নেপোলিয়ন, হিটলারের যুগাবসান বোধ হয় হয়েছে। কিন্তু ইরাক, আফগানিস্তানের পর সন্দেহ আবারও আসে।

পাওয়ার অ্যান্ড ভায়োলেন্স

আগের কালে হিংসার প্রয়োগ ছিল স্বাভাবিক, নিত্য নৈমিত্তিক। ক্ষমতা বা পাওয়ারের ভিত্তি ছিল ভায়োলেন্স করবার বিবিধ হাতিয়ার। হাতিয়ারের উন্নতি ভায়োলেন্স করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। হাতিয়ারকে কুক্ষিগত রাখবার সর্ববিধ প্রচেষ্টা সর্বত্র। নানা কারণে অস্ত্রের মনোপলি আজ কিছু কমেছে। মধ্যভারতের আদিবাসী অঞ্চলে আজ ডিনামাইট, একে ৪৭ ইত্যাদির ব্যাপক সহজলভ্যতা রাজনৈতিক সমীকরণ সমূহকে অনেকটাই প্রভাবিত করছে। বাধ্য হয়েই সরকারকেও এইসব বিবেচনায় আনতে হচ্ছে। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের ভায়োলেন্স করবার ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। সামরিক বাহিনী, অস্ত্রাদির সাথে তার হাতে আছে জীবিকাচ্যুত করার ক্ষমতা, বন্দী করে রাখা, ফাঁসি দেবার ক্ষমতা ইত্যাদি। তবে রাষ্ট্রের (বা বিরোধীদেরও) ক্ষমতা বা পাওয়ারের আসল ভিত্তি হল জনসমর্থন। জনসমর্থন কমে গেলে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বিরোধীদেরও 'পাওয়ার' অনিবার্যভাবেই কমে যায়। বলা যায় 'পাওয়ার' আর ভায়োলেন্স একে অপরের বিপরীত। একটা অন্যটাকে নষ্ট করে দেয়। জনসমর্থন কমলে পাওয়ার কমে কিন্তু ভায়োলেন্স বাড়ে এবং উল্টোদিকে জনসমর্থন বেশী থাকলে ভায়োলেন্স কমে।

লেনিন বিশ্বাস করতেন জাতি সমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র বাহুবলেই সম্ভব। মাও সে তুঙের কথা "বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস" দেওয়ালে দেওয়ালে আগে অনেক যা দেখেছি, তা অনেকটাই সত্য হতে পারে যদি তার পিছনে জনসমর্থন থাকে। না থাকলে কি হতে পারে চল্লিশবছর আগে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গে সেসব দেখেছি, এখনও দেখছি।

সব সর্বনাশের মূলে থাকে চিন্তার অবাস্তবতা ও বিভ্রান্তি

মানুষের বিভ্রান্তির ইতিহাস সুবিশাল। বিজ্ঞান জানতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে অতি অতি সামান্যই। তবে যেটুকু জানা গেছে, বোঝা গেছে তা অতি মূল্যবান, যা মানুষকে অনেক মঙ্গল দিয়েছে। গোটা পৃথিবী আজ বিজ্ঞানের ভক্ত। তাই বিজ্ঞানলব্ধ সত্যসমূহকে মানুষ সযত্নে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রেখেছে; দেশ থেকে দেশান্তরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করে যাচ্ছে। অনুরূপ ব্যাপারসমূহ সমাজবিজ্ঞানে ততটা হয়নি বলে মনে হয়, বিশেষ করে দর্শনে। তাই সমাজ বিজ্ঞানীরা এখনো বিভ্রান্তি উদ্ভূত নানান কাজকর্ম করেই যাচ্ছেন ও পৃথিবীর এত অনিষ্ট করেছেন, করছেন যা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এত অপপ্রয়োগেও হয় কি না সন্দেহ। ভ্রান্ত তত্ত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতির ভূমিকাই বেশী। বেশীর ভাগ দর্শনই যে ভ্রান্ত তা বার্ট্রান্ড রাসেলের বহু রচনায় সুন্দরভাবে পরিবেশিত। মার্কসীয় দর্শনের ভ্রান্তি নিয়ে কিছু বলা আজও ঝুঁকিপূর্ণ। সুদূর অতীতে জমিতে বীজ বোনার সময় একটি মানব শিশুকে কেটে তার রক্ত দিয়ে জমি সিক্ত করে কৃষির বীজ বোনা হত। এখন তার প্রয়োজন দেখা যায় না। মধ্যযুগের ইউরোপে (আমাদের দেশে বহু উপজাতি মহলে আজও) ডাইনী খোঁজা ও তাদের নির্মূল করার জন্য লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরপরাধ নরনারীকে মরণ-খুঁটি বা 'স্টেকে' জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। আমাদের দেশে কত নারীদের সতীদাহের নামে জীবিত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। প্যালেস্টাইনের পবিত্রভূমির দখল নিয়ে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের দুশো বছরের হাস্যকর ধর্মযুদ্ধ নিয়ে কত হানাহানি। হেগেল, নীটসের ভ্রান্ত দর্শন প্রভাবিত হিটলারের জার্মানীতে প্রায় ষাটলক্ষ

উত্তদীদের হত্যা করা হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি মেনে নিয়ে নেহেরু প্যাটেল জিন্নারা ভারতীয় উপমহাদেশে অশান্তি অনুন্নতি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার স্থায়ী বীজ বপন করে গেলেন। অনুন্নত জেনেটিকস্ এর ভ্রান্ত অপপ্রয়োগ করে ইউজেনিক্স বা সুপ্রজনন-এর কর্মসূচীতে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেক নিরীহ মানুষজনদের প্রচুর নির্যাতন ও প্রাণ দেওয়া হয়েছে। ১৮৭১ সালে বৃটিশরা "অপরাধ প্রবণ উপজাতি" আইন (Notified Criminal Tribes in British India) প্রণয়ন করে উপজাতি মানুষদের উপর দীর্ঘকাল বিপুল নির্যাতন নিধন চালিয়ে গেছে।

মানুষের মূর্খতা ও বিভ্রান্তির দীর্ঘ ইতিহাসের অনেক প্রামাণ্য পুস্তক সহজলভ্য এবং সে সব দুর্বোধ্যও নয়। কিন্তু ভ্রান্ত দর্শনজাত ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃতিবিচার ও মূল্যায়ন অত্যন্ত কঠিন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মার্কসীয় ভাবনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রায় শতবর্ষ ধরে মার্কসবাদ পৃথিবীর বহু প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সৎ মানুষজনকে বিভ্রান্ত ও মোহগ্রস্ত করে রেখেছিলো। মার্কসীয় ভাবধারায় ঠিক বেঠিক, ভালমন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ সবই থাকায় যাচাই করে গ্রহণ বর্জন সুকঠিন। মার্কসীয় চিন্তার ভাল দিকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি :

■ দর্শনকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করার অর্থাৎ তত্ত্ব ও প্রয়োগকে একত্রে দেখা

■ মুনাফা ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, উৎপাদনশীল শ্রম ও মূল্যের তত্ত্ব

ভ্রান্তির দিকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি :

■ উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে সব সমাজ ব্যবস্থার প্রধানতম ভিত্তি হিসেবে ধরা

■ মানুষকে "হোমোইকনোমিকাস" (homo ecOnomicus or economic man) মনে করা। অর্থনীতি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানুষের অন্যান্য আইডেনটিটি (বা পরিচয়) সমূহ গুরুত্বহীন নয়। যেমন : ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

■ মনস্তত্ত্বের স্থান বিশেষ না থাকা। অথচ মানুষ, সমাজ মানস ও মনস্তত্ত্ব দ্বারাই বিপুলভাবে প্রভাবিত ও পরিচালিত। মার্কসের বড় ভ্রান্তি — দার্শনিক ভ্রান্তি। মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক (থেসিস-অ্যান্টিথেসিস-সিন্থেসিস) ভাববাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। শেষ জীবনে মার্কস তাঁর বিপ্লবী আশা আকাঙ্ক্ষায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য : Eric Fromm : Sane Society, ১৯৫৮, পৃঃ ২২৬)।

দর্শনের যুক্তিবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গাণিতিক পদ্ধতির তুলনা

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় বিশিষ্ট অবদান কারী লুই ডি ব্রগলি, আইনস্টাইন ও ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের দুটো বিখ্যাত সমীকরণের সমন্বয় করে নতুন যে সমীকরণ সৃষ্টি করলেন তা কোয়ান্টাম বিপ্লবকে এগিয়ে নতুনতর শক্তিশালী প্রযুক্তিসমূহের সৃষ্টি করে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে দিল। ব্রগলির সাফল্যের কারণ হল — পূর্বোক্ত সমীকরণ দুটির ভিত্তি ছিল পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক সত্য ও গাণিতিক পদ্ধতি দর্শনের পরীক্ষাগার (মানব সমাজ মানস) স্থান ও কালের মাপে বিরাট। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও কঠিন এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বিশাল। দর্শনের যুক্তির (যা মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত) সাহায্যে সিদ্ধান্ত সমূহে বাস্তবতা কম বা নাই, যেমন বিজ্ঞানে আছে। কারণ বিজ্ঞানের ব্যাপারগুলি পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করা যায় এবং তার থাকে গাণিতিক ভিত্তি।

গাণিতিক সূত্রাবলী দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ('ফেনোমেনা') সুন্দর ভাবে প্রকাশিত ও উপস্থাপিত। কেন এমনটা হয় তা বুঝি না অথচ দর্শন ও গণিতের যুক্তিবিজ্ঞান উভয়েই মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গণিতের সাফল্যের একটা সম্ভাব্য কারণ তার চিন্তা চেতনামুক্ত বিষয়মুখীতা (অবজেকটিভ) ও অতিসরলীকরণের ('রিডাকশন') সুযোগ যা সমাজ বিজ্ঞান বা দর্শনে সম্ভব নয় তার কারণ সমাজ বিজ্ঞানে অসংখ্য আবেগ-অনুভূতি, সংস্কৃতি কৃষ্টির মানুষজনদের নিয়ে কাজ করতে হয়, যাদের মনস্তত্ত্ব আবার জিন ও পরিবেশের জটিল আন্তঃক্রিয়ার ফসল এবং স্থান কালে যা পরিবর্তিত হয়েই চলে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি সুন্দর বড় বৈশিষ্ট্য হল, তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু পূর্বাভাষ বা ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব। পরবর্তীতে পরীক্ষার মাধ্যমে যার সত্যতা প্রমাণিত হয়। না হলে তত্ত্ব পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়। সমাজবিজ্ঞানে এসব বিশেষ সম্ভব হয় না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিবর্তিত হয়, ক্রমাগত 'প্যারাডাইম' বদল হতে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানে সেরকম কমই হয়েছে।

দর্শনের বিভিন্ন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পথিকৃৎরা প্রায় একই রকম প্রাথমিক সর্তাবলী (Premisea) থেকে আরম্ভ করে অনুরূপ উদ্দেশ্যের সন্ধানে ছিদ্রহীন যুক্তিজাল বিস্তার করে যে সব সিদ্ধান্ত সমূহে পৌঁছান সে সব একে অপরের থেকে ভিন্নতরই শুধু নয়, বহুক্ষেত্রেই তাদের সিদ্ধান্তাবলী ভয়ঙ্করভাবে পরস্পর বিরোধী, এমনকি বিপরীতও। এই সবের প্রভাব দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অশেষ অকল্যাণ করেছে। তা হলে কি করে ভ্রান্ত ও সঠিক দর্শন চিহ্নিত করা যাবে? কোন উপায় নাই। তাঁদের জন্য বার্ট্রান্ড রাসেলের বিধান হল, সব দার্শনিককে নির্বাসন দেওয়া; জার্মান ইউনিভার্সিটি সমূহে ফিলজফির

প্রফেসরের চেয়ার স্ববে সসম্মানে তাদের সেখানে বসিয়ে দেওয়া এবং তাদের সৃষ্ট যৌক্তিক আবর্জনার (ইনটালেকচুয়াল র‍্যাবিশ) স্তূপকে সসম্মানে ইতিহাসের আর্কাইভে রেখে দেওয়া।

ফরাসী বিপ্লবকে হেগেল সামন্ততন্ত্রের অবসানের দ্যোতক মনে করতেন, আর প্রাশিয়ান রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল ধনতান্ত্রিক সমাজের শুভ সূচক মনে করতেন। তাঁর দর্শনের মূল কথা ডায়ালেকটিক আইডিয়ালিজম, যা ইতিহাসের চালক। হেগেলের প্রভাবে মার্কস ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অবৈজ্ঞানিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন এবং তাতে সর্বস্ব নিয়োগ করলেন। মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদ থেকে দ্বন্দ্ব নিয়ে ফয়ারবাখের যান্ত্রিক বস্তুবাদের যান্ত্রিকতা বাদ দিয়ে দুইএর সম্মেলন ঘটিয়ে 'হাঁসজারু' দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সৃষ্টি করলেন এবং তা ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করলেন। প্রাশিয়ান রাষ্ট্র হেগেলকে উচ্চবেতনের সম্মানীয় প্রফেসরের পদ দিয়েছিল। সুতরাং প্রগতিশীল ধনতন্ত্র হিসাবে প্রাশিয়াকে আদর্শ ভাবা স্বাভাবিক। আর মার্কস অত্যন্ত তেজী মেধাবী মানবিক হয়ে সারাজীবন দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রাম করেই নৈরাশ্যে মারা গেলেন। তাঁর 'দুর্বুদ্ধি' হয়েছিল দর্শনে "তত্ত্ব ও প্রয়োগকে" মেলানোর সংগ্রামে ব্রতী হওয়া। হায় মার্কস! লন্ডনের হাইগেট কবরখানায় মার্কসকে দেখলাম ফ্যারাডের পাশে অনন্তশয্যায়। ফ্যারাডের কবর অসংস্কৃত, অপরিচ্ছন্ন; মার্কসেরটি ঝকঝকে, সযত্নে রক্ষিত। কারণ আগে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সমূহের নেতারা মার্কসের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ ভঙ্গীতে ছবি নিতেন স্বদেশে প্রদর্শনীর জন্য। মানুষের জীবন ও সভ্যতার উন্নতিতে কার অবদান বেশী, কার্ল মার্কসের না মাইকেল ফ্যারাডের-বিষয়টি ভাববার। ভ্রান্তদর্শনের অনিবার্য পরিণতি অলঙ্ঘনীয়। এই ভ্রান্তি বুঝতে শতাধিক বৎসর লেগে গেল।

কম্যুনিষ্ট বিপ্লবীদের সমাজতান্ত্রিক স্বর্গ = হিন্দুদের পরজন্মে স্বর্গবাস

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ ব্যবস্থাকে ধরে রাখায় বিশেষ সমস্যাদি হত না। বিদ্রোহ বিপ্লবের কথাও বিশেষ শোনা যায় না। তখন কি শোষণ নির্যাতন ছিল না? তেজী বুদ্ধিমান সাহসী মানুষজন ছিল না? অবশ্যই ছিল। তা সত্বেও লোকে শান্ত, নতমস্তকে থাকত। নিজেদের দুঃখ কষ্টকে অনিবার্য যন্ত্রণা বলে নিজের 'ভাগ্য'কে, 'অদৃষ্ট'কে দায়ী করে সব মেনে নিত। ক্ষত্রিয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণরা শিখিয়েছিল "কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ"। ইহ জীবনের দুঃখকষ্টের জন্য বিগতজন্মের কর্মফলকে দায়ী করিয়ে রাজা ও সমাজের উপরতলার মানুষজন ভালই আরামে জীবন কাটাতেন। (দেখুন : **Science and Superstition by M N Roy, 1940**)। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ধর্মভাব ও কুসংস্কারের প্রবল প্রভাবের গুরুত্ব ডি ডি কোশাম্বীও লিখে গেছেন।

অনুরূপে এখন দেখছি বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের শোষণহীন স্বর্গের অনিশ্চিত কল্পলোকের স্বপ্নে কত কমরেডকে মোহাবিষ্ট রেখে বামপন্থী নেতারা বেশ ভালই করে কম্মে খাচ্ছেন। এ কি পুরাতন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নবরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা? তবে এখন লোকের মোহভঙ্গ হচ্ছে। মার্কসবাদের শেষ অভয়ারণ্য পশ্চিমবঙ্গেও মার্কসবাদের প্রভাব দ্রুত কমছে।

পুরাতন সেই ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত

আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, বিশ্বাস করে আসছি ভারত স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং কংগ্রেস, গান্ধী স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। অসীম শক্তিশালী গান্ধীবাদী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্য বৃটিশকে ভারত ছেড়ে যেতে হয়। সর্বত্র দেখি গান্ধী, নেহেরু ইত্যাদির জয়জয়কার। কম লোকই এ সব খতিয়ে দেখে।

আসলে বিজয়ীরাই ইতিহাস লেখে, যেমন নেপোলিয়ন বলতেন। অরওয়েলিয় ভাবে বলা যায় —

> Those who control the present control the past;
> Those who control the past control the future.

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন হাতে ক্ষমতা থাকলে সব অসম্ভব অবাস্তব জিনিসও লোককে অনায়াসে বিশ্বাস করানো যায়। আর নাৎসী প্রোপাগান্ডা মিনিস্টার গোয়েবল্‌স এর কথা তো সবাই জানে।

গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের শক্তির প্রশস্তি শুধু ভারতেই নয়, উন্নত বহুদেশের বহু ভাল মানুষজন, রাষ্ট্রনায়করা এখনো করে থাকেন। তবে গান্ধীর নাম বহুবার মনোনয়ন হওয়া সত্বেও তাঁকে শান্তির নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি। গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে বৃটিশরা গ্রাহ্য করত না।

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের অনেকেই মনে করেন গান্ধীকে যদি জার্মানীর হিটলার বা রাশিয়ার স্টালিনের মত প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হত, তা হলে হত বিরাট গণহত্যা ও জবরদস্তি বশ্যতা স্বীকার। বৃটিশদের ভারতে, আর ফরাসীদের আলজিরিয়াতে সংযত থাকার নিজস্ব বিশেষ কারণ সমূহ ছিল। বৃটিশরা গান্ধীকে সামান্য উৎপাৎ মাত্র মনে করত। বরং অন্যদিকে বৃটিশদের কিছু সুবিধাও হত। গান্ধীর অহিংস

আন্দোলন জনসাধারণের রোষানলের উত্তাপ বার করে দেবার "সেফটি ভালভ্" হিসাবে কাজ করত।

তথাপি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ১৯৪৩ সালে গান্ধীর কাজকর্মের খবরে রেগে আগুন হয়ে বলেছিলেন : গান্ধীর হাত পা শক্ত করে বেঁধে দিল্লী গেটের সামনে ফেলে প্রকাণ্ড একটা হাতি দিয়ে পিষে ফেলা হোক। সেই হাতির পিঠে থাকবে ভারতের নবনিযুক্ত ভাইসরয়। ১৯৫৬ সালে কলকাতার রাজভবনে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড অ্যাটলী রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে কদিন থাকছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল জাস্টিস পি বি চক্রবর্তী অ্যাটলীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে বৃটিশদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার উপর গান্ধীর প্রভাব কতটা ছিল? উত্তরে অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক তাচ্ছিল্যের হাসিতে অ্যাটলীর ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে যায়। অতি ধীরে অবজ্ঞাভরে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন একটিমাত্র শব্দ: অতি সামান্য, "m-i-n-i-m-a-l"

অহিংসা: অমানবিকতা ও বীর্যহীনতার দ্যোতক

যুবক অমর্ত্য সেন ১৯৬০ এর দশকে ট্রাইকন্টিনেন্টাল পত্রিকায় লিখেছিলেন : **Armed stuggle is also a democratic form of struggle** (স্মৃতি থেকে লিখছি)। যাদের মনুষ্যত্ব আছে, বীর্য আছে, তাঁদের কখনো 'ভায়োলেন্ট' হওয়া অস্বাভাবিক নয়। প্রেমের ঠাকুর শ্রী চৈতন্যদেবও কখনো যে ভায়োলেন্ট হন নি এমন নয়। "মার কাজী' বলে ক্রুদ্ধ চৈতন্যদেব দলবল খোল করতাল নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন, তখন কাজী ভয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত চিরভদ্র, সংযত, বিচক্ষণ মানুষও একবার রেগে আগুন হয়ে বলেছিলেন যারা (অর্থাৎ বৃটিশরা) দুশো বছর রাজত্ব করেও গ্রামের অসহায় মানুষদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে না, তৃষ্ণায় মানুষের বুক ফেটে যায়, আমার হাতে বন্দুক থাকলে দিতাম গুড়ুম করে। (দেখুন : বাইশে শ্রাবণ— নির্মল কুমারী মহলানবীশ, মিত্র ও ঘোষ)। আজ যারা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে স্বনিযুক্ত তাদের সহজে তাচ্ছিল্য করা যায় কি? ভাবা উচিত কিসের তাগিদে তাঁরা জীবন দেয়, জীবন নেয়।

গান্ধীর সার্বিক ব্যর্থতা

বৃটিশরা অহিংস গান্ধীবাদীদের কিছুমাত্র যে ভয় করত না, তা পূর্বোল্লেখিত। তারা ভয় করত সশস্ত্র বিপ্লবীদের। নির্মমভাবে তাদের অবদমন করত, ফাঁসী দিত। গান্ধীকে বৃটিশরা জেলেও তোয়াজেই রাখত। গান্ধী আবার হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবীদের সাহায্যে কখনোই আসতেন না। গান্ধী সচেতনভাবে বৃটিশদের সাহায্যের জন্য কিছু করতেন, এমন মনে হয় না। তবে তাঁর অনুসৃত অহিংসনীতি, বিপ্লবীদের বিরোধিতা, তাঁর মনের কুসংস্কার, ধর্মীয়ভাব— এসবের জন্য তিনি উন্নত আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করতেন না। এইসব দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি, প্রগতিশীল বাস্তবধর্মী মানসিকতা সবিশেষ উন্নত। এ প্রসঙ্গে আশ্চর্যকথা, সেই রবীন্দ্রনাথকেই ১৯১৪ সালে আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবীরা হত্যার প্রস্তুতি নিয়েছিল, শেষ মুহূর্তে যা ভেস্তে যায়।

জওহরলাল, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতিরা গান্ধীকে স্বাধীনতার আগেই অকিঞ্চিৎকর গণ্য করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে গান্ধীর অর্থনীতি ও সমাজনীতি সমূহ গৃহীতও হয় নাই। অথচ গান্ধীর একধরণের সততা ও আন্তরিকতা ছিল। তাই নাথুরাম গডসে গান্ধীকে হত্যা না করলে তিনি হয়তো ব্যর্থতা ও দুঃখ বুকে নিয়ে হার্টফেল করেই মারা যেতেন। তিনি দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রক্তপাত দেখে অবশ্যই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর সার্বিক ব্যর্থতার জন্য তাঁর মনস্তত্ব, শিক্ষার অভাব ও চিন্তার ভ্রান্তিই দায়ী। যদি কেউ মনে করেন গান্ধী ভারতে গণজাগরণ ঘটিয়ে স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তবে স্বদেশী আমলের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, তারও আগের ১৯ শতকের আদিবাসী ও সিপাহী বিদ্রোহের অবদানের কথাও বলতে হয়, আরো বেশী করে বলতে হয়। তবে বৃটিশদের ভারতছাড়া ও স্বাধীনতা দেওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা হয়েছিল ১৯৪৫ সালের সুভাষ বসুর আজাদহিন্দ ফৌজ ও ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। নৌবিদ্রোহের ঠিক পরের দিনই ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার কথা প্রথম সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। সেই ইতিহাস আজও বহুজনবিদিত নয়।

পর্ব দুই

সুভাষ বসু আজাদহিন্দ ফৌজ ও নৌবিদ্রোহীরা

"লস্ট দি ব্যাটল, বাট ওন দি ওয়ার"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে হয়েছিল প্রায় শতবর্ষ ধরে। তবে বৃটিশদের শেষ চরম মারণ আঘাত হানেন সুভাষ বোসের আজাদহিন্দ ফৌজ, যার ফলেই বৃটিশকে ভারত ছাড়তে হয়। কলকাতার রাজভবনে ১৯৫৬ সালের যে আলোচনা হয় (পূর্বোল্লেখিত) সেখানে তদানীন্তন প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল — ১৯৪২ এর আন্দোলন বখন থেমেই প্রায় গিয়েছিল আর দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতেও বড় কিছু ঘটছিল না, তখন

১৯৪৭ সালে হঠাৎ এত দ্রুত বৃটিশকে কেন ভারত ছাড়তে হল?

অ্যাটলীর উত্তর ছিল : "সুভাষ বোসের মিলিটারি কার্য্য কলাপের ফলে ভারতের সামরিক ও নৌবাহিনীর লোকেদের মধ্যে বৃটিশ রাজমুকুটের প্রতি ব্যাপক আনুগত্য হ্রাস।"

বৃটিশ পার্লামেন্টারী যে সর্বদলীয় ডেলিগেশনটি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী — ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে গেলেন তার প্রধান লেবার পার্টির এম পি প্রফেসার ক্র্যাঙ্ক রিচার্ডস লন্ডনে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীকে সোজাসাপটা বলেন :

"আমাদের তাড়াতাড়ি ভারত ছেড়ে চলে আসতেই হবে। যদি আমরা তা না করি, তবে আমাদের ওরা লাথি মেরে তাড়াবে (দ্রষ্টব্য : Gautam Chattopadhyay–The Almost Revolution . Essays in Honour of Sushobhan Sarkar, 1976)।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র ভয়ঙ্কর সংগ্রামই ভারতীয় জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। ঠিক সুভাষ বোস যেমনটা আশা করেছিলেন। আই এন এ'র তিনজন সর্বোচ্চ অফিসার জেনারেল শাহনওয়াজ খান (মুসলমান), কলোনেল প্রেম সেহগল (হিন্দু), এবং কলোনেল গুরুবক্স সিং ধীলন (শিখ) এই তিনজনকে "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ" করার অপরাধের বিচারের জন্য দিল্লীর লালকেল্লায় আনা হল। এব্যাপারে আশ্চর্য লক্ষণীয় হল এইসব বিচার সাধারণত প্রকাশ্য জনসমক্ষে হয় না। যে নেহেরু সর্বদা সুভাষ বোস ও আই এন এর বিরোধীতা করে গেছেন, তিনিই আবার বিচারের সময় তাঁদের আইনী সুরক্ষা দেবার জন্য ব্যারিষ্টারের কালো কোট পরে বিচার সভায় উপস্থিত হলেন। ঐ সময়েই নেহেরু, গান্ধী, জিন্না, আজাদ এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে সুভাষ বোস ফিরে এলে (অনেকেই তখন মনে করেছিল সুভাষ বোস ১৯৪৫ সালে মারা যাননি) তাঁকে বৃটিশের হাতে রাজদ্রোহের অপরাধের বিচারের জন্য তুলে দেওয়া হবে। অন্যদিকে তিনজন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারের পক্ষে ওকালতি করে নেহেরু সুভাষবিরোধীতায় ক্ষতিগ্রস্ত তাঁর ভাবমূর্তিকে রক্ষাই শুধু করলেন না, উজ্জ্বলতরও করতে পারলেন। বৃটিশরা সর্বতোভাবে নেহেরুকে সাহায্য করে গিয়েছিল। যার ফলে বৃটিশ সহযোগীতায় হিন্দু নেহেরুই হাজার বছর পরে দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন, পৃথ্বীরাজ চৌহানের পর। এখন তাঁর বংশই রাজত্ব করছে ফরাসী বিপ্লবের পর নেপোলিয়ান ও তাঁর বংশধররা ফ্রান্সের সিংহাসনে অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন।

লালকিলায় যখন আই এন এ অফিসারদের বিচার চলছিল তখন সারা দেশ বৃটিশ বিদ্বেষে ও দেশপ্রেমে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনী মুখে মুখে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী বম্বেতে নৌবিদ্রোহ শুরু হল। বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল করাচী, কলকাতা, কোচিন,ভাইজাগে। প্রায় ষাট হাজার সেনানী নৌবিদ্রোহে সামিল হলেন। ব্যাটলসিপ আই এন এস তলোয়ার, আই এন এস খাইবারের অপূর্ব বীরত্ব কথা রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরের নৌবহরের ব্যাটলসিপ পটেমকিনকেও (১৯০৫) ছাপিয়ে গিয়েছিল। (দ্রষ্টব্য : ফণীভূষণ ভট্টাচার্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ "নৌবিদ্রোহের ইতিহাস", ১৯৭৯; সুমিত সরকারের মর্ডাণ ইন্ডিয়া : ১৮৮৫ - ১৯৪৭; ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের উপর চমৎকার বিভিন্ন ওয়েবসাইট)। নৌবিদ্রহীগণ ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে নেতৃত্ব দেবার আহবান জানিয়ে বিফল হন। একমাত্র অরুণা আসফ আলী বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছিলেন। কমুনিষ্ট পার্টি প্রত্যক্ষ বিরোধীতা বা বিশ্বাসঘাতকতা হয়তো করেনি, কিন্তু নেতৃত্ব দেবার জায়গাতেও উঠে আসতে পারেনি। অসীম আত্মত্যাগ ও বীরত্বের এই মহান সংগ্রামকে নষ্ট করে দিয়েছিল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ -গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ প্রভৃতিরা। জিন্নাও এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাননি। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিভাজন সব ছাড়িয়ে সত্যিকার স্বাধীনতার যে সুযোগ বিদ্রাহীরা করে দিয়েছিল তাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। নৌবিদ্রাহীদের যথার্থ স্বীকৃতি ও প্রাপ্য সম্মান কখনোই দেওয়া হয় নাই। অথচ হাজার হাজার নৌবিদ্রোহীদের হত্যা করা হয়েছে। বম্বের ফ্রি প্রেস জার্ণাল ছাড়া আর কোন পত্রপত্রিকায় বিদ্রোহের সংবাদও প্রকাশিত হয় নাই। নৌবিদ্রোহের তিনমাস পরে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল তাতে ছিলেন :

টেকচাঁদ, কোয়ার দুলিম সিং, জয়াকার, বিচারপতি জাফরুল্লাহ, কে বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, বিচারপতি বিশ্বাস ও স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার।

কিন্তু ছশো পৃষ্ঠার সেই রিপোর্ট পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে কখনোই উপস্থিত করা হয় নাই। সেটি দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভসে আছে। তার প্রকাশের জন্য বাম বা দক্ষিণপন্থী কোন দলই দাবী করেননি।

ভারতীয় নৌবিদ্রোহের উপর উৎপল দত্ত যে "কল্লোল" নাটক লেখেন ও মঞ্চস্থ করেন তা আমরা অনেকেই দেখেছিলাম। তার জন্য ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে জেলে যেতে হয়।

নৌবিদ্রোহ ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে হয়। ঠিক তার পরদিনই ১৯ শে ফেব্রুয়ারী বিলাতে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী ভারতে

পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করেন (দ্রষ্টব্য রজনী পাম দত্তের India Today, গৌতম চট্টোপাধ্যায় — The Almost Revolution : Essays in honour of Sushobhan Sarkar, 1976)।

বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ করে ভারত ও পাকিস্তানের দলংবদলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন হলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি জিন্না পাকিস্তানের। বৃটিশ রাজ কর্তৃত্বের উৎস সন্ধানে গেলে পৌঁছতে হবে তাদের কর্তৃত্বের উৎসে, সেই ১০৬৬ সালের উইলিয়াম দি কনকারারে। (দ্রষ্টব্য . Thomas Payne : The Rights of Man, 1792)। ভারতীয় জনসাধারণ সর্বজনীন ভোট মাধ্যমে কংগ্রেসকে ক্ষমতা দেয়নি। ভারতীয় সংবিধানের প্রায় ৭৫ শতাংশই ১৯৩৫ সালের বৃটিশ আইনের আদলে বানানো। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী গৃহীত সংবিধান যে গণপরিষদে তৈরী ও গৃহীত হয়েছিল তার ৩৮৯ জন সদস্য (ভারত থেকে ২৯৬ জন, দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ৯৩ জন) দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশের ভোটে নির্বাচিত। ভারতকে তাই গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় কিনা এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

কিছু কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা ও অহমিকার ফলে দেশপ্রেমী সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ করে দিয়ে, দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করে সাম্প্রদায়িকতার স্থায়ী বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে তাঁরা মহান দেশ নেতা হলেন। স্বাধীনতার এই ইতিহাস এখনো পুরোমাত্রায় অনুদ্‌ঘাটিত।

পর্ব তিন

এখন কর্তব্য ? দুঃসময়, সুসময়ও বটে

এই সময়ে বেশ কিছু বলা যায়, দেখা যায়, বোধ হয় করাও যায়। স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বিবেচনা নিয়ে অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও অনুধাবন প্রয়োজন। ভারত তথা পৃথিবীতে মার্কসীয় ভাবধারার ভবিষ্যৎ দেখা যায় না। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহ, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি আজকের সর্বাধিক উন্নত দেশগুলি মার্কসীয় পথ ছাড়াই উন্নতির প্রায় শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছে। ভারতেই শুধু বিপ্লবোত্তর সমাজতন্ত্রের অলীক স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে মোহগ্রস্ত বিভ্রান্ত রাখা হয়েছে। মানুষকে এবারে বলতে হবে বোঝাতে হবে পরজন্মে নয়, বিপ্লবোত্তর সমাজতন্ত্রেও নয়, আমরা সকলে এখুনি আরো একটু ভাল থাকতে চাই। মানুষই বলুক কিসে কি করে তারা ভাল থাকতে পারে।

আমরা সকলে আমাদের গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য বা আইডেন্টিটি বজায় রেখেও পৃথকভাবে কিংবা একত্রে কাজ করতে পারি। বিরোধ সর্বক্ষেত্রে অনিবার্য। বিরোধ বা conflicts মীমাংসার জন্য আমরা অহিংসতা, পারস্পরিক কথন, আলোচনা, সহনশীলতা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও পরিবেশের উন্নয়নকে চালাতে হবে। সংখ্যালঘুদের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, সংস্কৃতির মর্যাদা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে টি এস ইলিয়টের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ্য (Notes Towards the Definition of Culture, 1948)।

"শ্রেণীহীন কোন সমাজ বা দৃঢ়ভাবে বাঁধা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, কোনটাই ভাল নয়। ... সর্বসাধারণ শক্তিকেন্দ্রে আমরা শান্তির অপচয় বলি। ... শ্রেণীহীন, একটি সমাজ অনিবার্য ভাবে শ্রেণীবিভক্তির দিকে যাবেই। আর শ্রেণীবিভক্ত সমাজ শ্রেণী বিভাজন লোপাদের দিকে যাবেই। ... তাই কিছু সীমার মধ্যে দাঁড়াতে ব্যক্তিবর্গই শুধু নয়, গোষ্ঠীর ও গোষ্ঠীতে ঘর্ষণ, কিছু সংঘাত সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয়। (প্রাণশক্তির দ্যোতক বটে— অনুবাদকের সংযোজন)। কলহ ও বিবাদের সর্বব্যাপী বিরামহীনতা দীর্ঘস্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। যে দেশে শ্রেণী বিভাজন মাত্রাধিক বেশী এগোয় সেই দেশ নিজের কাছেই অধিক বিপজ্জনক। আবার যে দেশ অত্যাধিক বেশী মাত্রায় একত্রিত, তা স্বাভাবিক ভাবেই হোক বা পরিকল্পনামাফিকই হোক, সদুদ্দেশ্যেই হোক বা কুমতলব অবদমিতেই হোক, সেই দেশ অন্য দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। ইটালী ও জার্মানীতে আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ও জবরদস্তিতে ঐক্য চাপানো হয়েছিল, তা দুই দেশের পক্ষেই দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া করেছে। সর্বোত্তম বল প্রয়োগ যায় এবং অবশ্যই গৃহ ও সব নগণ্যদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতেই হবে।"

মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা ইউটোপিয়া নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঐ রকম সমাজতন্ত্র পৃথিবীর কোথাও কখনো ছিলই না, বিপ্লবোত্তর রাশিয়া চিনেও প্রতিষ্ঠিত হল না। ইলিয়টের ধারণাই সঠিক মনে হয়। অমর্ত্য সেনের সাম্প্রতিক চমৎকার রচনা Identity and Violence গ্রন্থটির কথাও বিবেচনা করা যায়। ১৯৫০ এর দশকে আবাদী কংগ্রেসে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের' কথা হয়েছিল। তা কেমন আজ মনে নাই। তাই দ্বিখণ্ডিত সমাজবিভাজনের বহুজাতিক গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে পরিচালিত হওয়াই শ্রেয় মনে হয়। [নকশাচিত্রের বক্স-৩ প্রদর্শিত]। সমাজ, বিশেষ করে ভারতের মত বড় দেশের সমাজকে, ইচ্ছা করলেই পরিকল্পিত দিকে নিয়ে যাওয়া যায়

না। তা করতে হলে জার্মানী, রাশিয়ার মত একদলতান্ত্রিক শাসনে জবরদস্তি পরিচালিত করতে হয়। যার পরিণতি যে শুভ হয় না তা আজ বোঝা গেছে। এত জবরদস্তি, এত অত্যাচার, ব্যাপক নরহত্যা যা হয়েছিল তা আজ প্রকাশ্যে আসছে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" তেও এধরণের কিছু ইঙ্গিত আছে। সুতরাং মার্কসের কথা তুলেই বলি 'বাস্তব থেকে শুরু কর, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ো নয়'।

মার্কসের ধারণা অনুযায়ী একটি অগ্রগামী ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণী বিভাজন ও বৈষম্য অনিবার্যভাবে এতদূর চলে যাবে যে তাতে স্বাভাবিক নিয়মেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবেই। এরকম শ্রেণী বিভক্ত সমাজ তো টি এন টি, নাইট্রোগ্লিসারিনের মত শক্তিশালী রাসায়নিক বিস্ফোরকের মতো। আজকের যুগে কোন দেশের সরকারই সেই অবস্থার দিকে সমাজকে নিয়ে যেতে দেয় না, দেবে না। সুতরাং স্বাভাবিক বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ (বক্স ২ থেকে ৪) হবেই না। ছোট বড় নানা ধরণের অনিবার্য সংঘর্ষ সংঘাতের মধ্য দিয়ে হ্রস্বিত শ্রেণীবিভাজনের উন্নততর সমাজের পথে বিবর্তন হবেই (বক্স ৩ থেকে ৪)। কিন্তু মেশিনটি চলবে, টেকসইও হবে

আজকে হিংসা বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে সংঘাত-সঙ্ঘর্ষ এত

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিভিন্ন আদর্শ মানব সমাজের পারস্পরিক সম্ভাব্য রূপান্তরের কল্পিত নকশাচিত্র
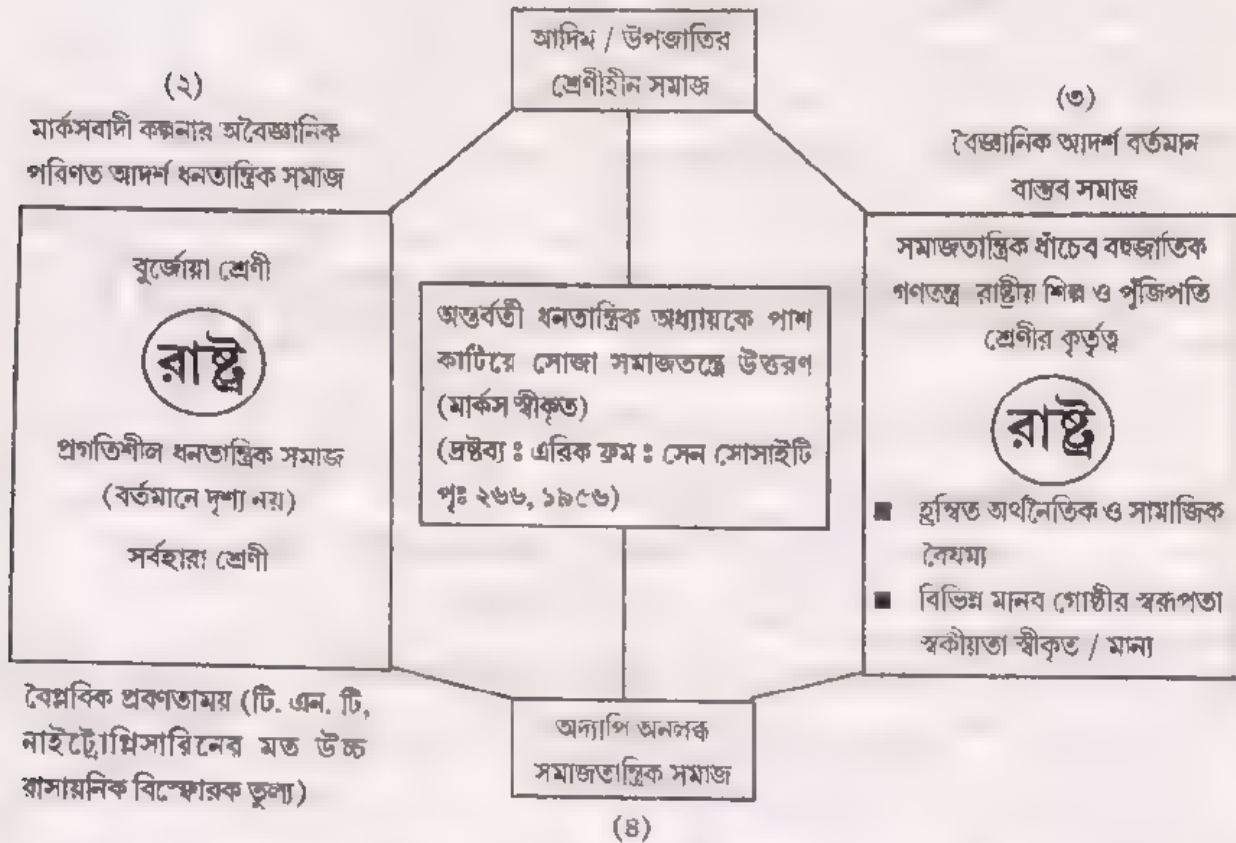
মন্তব্য : শ্রেণীহীন সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল শ্রেণীবিভক্তির দিকে যাওয়া, আর শ্রেণী বিভক্ত সমাজের শ্রেণী বৈষম্য কমানোর। নিত্য সামান্য বিবাদ বিসম্বাদ তাই অনিবার্য, যা সামাজিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পক্ষে অনুকূল। এনট্রপি নীতির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

বেশী যা সমাজ ইঞ্জিনটাকেই ভেঙে দেওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র ও নীতি নির্ধারকদের দায়িত্বই বেশী। সুতরাং যন্ত্রাংশ সদৃশ বিভিন্ন গোষ্ঠী সমূহের গতির দিশা নির্ধারণই প্রাথমিক কর্তব্য। এখানে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও কিছু থাকবেই। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত মধ্যভারতীয় অঞ্চলের অত্যধিক হিংসা সন্ত্রাসে বিচলিত হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের প্রেরণা। আমাদের মনে রাখা উচিত আদিবাসীরা পৃথিবীর সর্বত্র এবং ভারতেও কখনোই মানুষের মর্যাদা পায় নাই। সাধারণ নাগরিক অধিকার, মানবাধিকারও নয়। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা নাতিদূর অতীতে দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় যে নির্মম অত্যাচার শোষণ নিপীড়ণ করেছে তার জন্য তাদের ঘৃণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরাও এদেশের আদিবাসীদের অনুরূপ অত্যাচার কম করেনি। অস্ত্র বিজ্ঞান-প্রযুক্তি অনুন্নত থাকায় আমাদের পূর্বপুরুষরা ইউরোপীয়দের মত অত ভয়ঙ্কর অত্যাচার না করে উঠতে পারলেও তাদের উপর অত্যাচার শোষণ নির্যাতন যথেষ্ট ভয়ঙ্কর ছিল। আজও তার অবসান যে হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

এ সবের দ্রুত অবসান প্রয়োজন এবং পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্য একান্ত কাম্য। সর্বপ্রথম দাবী হওয়া উচিত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহের জল জঙ্গল জমি তাদের সম্মতি (informed consent) ছাড়া অধিগ্রহণ করা যাবে না। শিল্পায়ন বা অন্য কাজে জমি অধিগ্রহণ যদি করতেই হয়, তবে তা এমনভাবে করতে হবে যেন অঞ্চলের জল জমি ইকোসিস্টেমের স্বাস্থ্য হানি না হয়। সেই সব উদ্যোগ সমূহের ন্যায্য লভ্যাংশও যেন অঞ্চলবাসীরা পায়। ঐ সব অঞ্চলে যেহেতু সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা নাই এবং প্রকৃতি আশ্রয়ী ও সহযোগীতার ভিত্তিতে পরিচালিত, তাই অনুন্নত আদিবাসী অঞ্চলে ধনতন্ত্রকে পাশ কাটিয়ে সোজা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাব্যতাও বিবেচনা করে দেখা উচিত (বক্স ১ থেকে ৪)। এই সম্ভবনায় শেষজীবনে হতাশাগ্রস্ত মার্কসও উৎসাহিত ছিলেন।

কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ - জ্ঞান সংহারের উদ্যোগ

শুভাশিস মুখার্জী

বিশ্বায়নের দু-দশক অতিক্রান্ত। সে প্রক্রিয়াকে 'আর্থিক উদারীকরণ নীতি' বলে প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরসীমা রাও বর্ণনা করেছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো তা হলো চূড়ান্ত অনুদার যাকে বলা হয়েছিল মুক্ত প্রতিযোগিতা, তা পর্যবসিত হলো বাজার থেকে প্রতিযোগিতা তুলে দিয়ে। মার্কিন পণ্য, যা কিছু মার্কিন তার একচেটিয়া বিপণন, জাতির জীবনের সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত মার্কিন আধিপত্য এই হলো দু দশকের তথাকথিত 'আর্থিক উদারনীতি' এর 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' এর নির্যাস।

কাঠামো যে পুনর্গঠিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই - ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোটি মার্কিন দেশের সুবিধার জন্য ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ গত দুদশক ধরে, ভারতের জনমতকে কখনও উপেক্ষা করে, কখনও অত্যাচার করে পুনর্গঠিত করছেন। এখনও সেই পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ যে হয়নি তার কারণ ভারতের শ্রমজীবী জনগণ গত দু-দশক ধরে এই জনবিরোধী প্রক্রিয়াটির সমর্থক বিরোধিতা করে আসছেন, কখনও কখনও সেই প্রক্রিয়াটির রূপায়ণের হার-টিকে শ্লথ করতেও সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাতেও ইংরেজ রাজপুরুষের হাতে গড়া কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলটির বর্তমান প্রজন্মের নেতৃত্ব কৃষককে শতবর্ষের সমঝোতা, দালালির ঐতিহ্য অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত করা যায়নি।

> **মনমোহন সিং মহাশয় ২০০৫ সালে মার্কিন দেশ ভ্রমণের সময় ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আধাগোপনে ... "কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ" চুক্তিটিও সম্পন্ন করে এসেছেন। ...**

ইতালিয় নেত্রী সনিয়া এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন চাকুরে মনমোহন সিং-এর সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো, ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পদাঙ্ক অনুসরণেই চলছে, তাতে সন্দেহ নেই। দেশের নেতাদের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো দশের জন্য কী সংকেতবাহী আমরা মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নিয়ে সেই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

"রাতের আঁধারে" সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে গ্যাট চুক্তিতে সই দেওয়ার পর যে প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালে, কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরসিমা রাও তাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে "কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' এবং "আর্থিক উদারীকরণ নীতি" চালু করালেন। পরবর্তী বিভিন্ন রং-এর এবং "পথ"-এর প্রধানমন্ত্রী বৃন্দ নরসিমা-প্রদর্শিত পথটাকে কতটা মসৃণ করা যায়, সে মসৃণ পথ বেয়ে কত দ্রুত 'অভীষ্ট লক্ষ্য" -এ পৌছানো যায়, তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। কড়া হিন্দুত্বপন্থী প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী যেখানে শেষ করেন, "ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসী সংস্কৃতি' -র ধারক-বাহক মনমোহন শুরু করেন ঠিক সেইখান থেকেই। একবার কংগ্রেস বিজেপি সরকারকে গ্যাট-চুক্তি মোতাবেক ভারতের পেটেন্ট আইনের প্রথম সংশোধনীতে সহায়তা করে (বস্তুত কংগ্রেস সরকার প্রধান বিরোধী পক্ষ হিসেবে বিজেপি সরকারের আনা সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট না দিলে ভারতের পেটেন্ট আইন আজও অসংশোধিতই থেকে যেতো)। প্রতিদান স্বরূপই হয়তো বা ভারতের পেটেন্ট আইনের আপততঃ সর্বশেষ সংশোধনী (যাতে ভারতের সার্বভৌমত্ব কার্যত বিসর্জিত হলো) সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সমর্থনে কংগ্রেস সরকার সংসদে পাশ করতে সক্ষম হয়। এই দুই দলের যুগলবন্দীতে অতঃপর ভারতের নতুন পরাধীনতার সূত্রপাত হলো। আমরা প্রধানতঃ কৃষি এবং কৃষি-শিক্ষার বিষয়টি আলোচনা করে ভারতের মার্কিনীকরণের প্রক্রিয়াটির নানাদিক নিয়ে আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপের মাটিতে একধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার মাটিতে সেই একই সময়কালে পরিবর্তনের ধাঁচটা ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো ফ্যাসিবাদের হাত থেকে সদ্যমুক্ত হয়ে রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয় আর "পশ্চিম" ইউরোপের দেশগুলো আপাততঃ তাদের ঐতিহাসিক হানাহানির পথ পরিহার করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করে। এই কর্মকান্ডে গৌরী সেনের টাকার থলি হাতে হাজির হয় মার্কিন দেশ যাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিলো সামান্য, কিন্তু দখলে ছিলো পৃথীবির স্থলভাগের এক পঞ্চমাংশ, বিজিত দেশগুলোর বাস্তব সম্পদ (যেমন ইউরেনিয়াম, প্ল্যাটিনাম, সোনা, থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী,

ভারতের কৃষিক্ষেত্র ঃ মার্কিন দেশের নতুন মৃগয়াস্থল

প্রশান্ত মহলনবীশ-এর তত্ত্বাবধানে যখন ভারতের পাঁচশালা পরিকল্পনা এবং যোজনা পর্ষদ গঠিত হলো তখন স্বভাবতই ভারতবাসীর ধারণা হলো যে এইবার স্বাধীন সরকার একটি স্বাধীন, স্বউদ্যোগী এমন একটি পরিকল্পনা ও কাঠামো নির্মাণ করবেন যা ভারতের আপামর জনগণের আকাঙ্খার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটিয়ে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের পথে অগ্রসর হবে।

কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য - ভারতের পাঁচশালা পরিকল্পনার মূল হোতা রূপে আবির্ভূত হলো মার্কিন দেশের ফোর্ড ফাউন্ডেশন এবং মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় এম আইটি। ১৯৫১ সালে এম আইটি বিশ্ববদ্যালয়ের অধীনে স্থাপিত হলো সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিস যারা ভারতের পাঁচশালা পরিকল্পনা রচনার জন্য সাহায্য দিতো এবং নামে ইন্টারন্যাশন্যাল হলেও তারা কেবলমাত্র ভারতকেই তাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার স্থান হিসেবে বেছে নেন। এ কেন্দ্রটির সর্বময় কর্তা ছিলেন ম্যাক্স মিলিকান যাঁর অন্যতম পরিচয় হলো যে তিনি ছিলেন মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা, সি আইএ-র তৎকালীন ডেপুট ডিরেক্টর। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট নেহরু তাঁর "মহাকালের সঙ্গে বোঝাপড়া" সংক্রান্ত বিখ্যাত বক্তৃতার সব জায়গায় বললেন যে ভারত সরকার তার যোজনা পর্ষদকের মার্কিন সেনেট-এর উপাঙ্গ বলেই মনে করে।

নেহরু তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র ইটাওয়াতে মার্কিন কৃষি গবেষকদের (বলাই বাহুল্য এম আইটির সিআইএ পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এর মাধ্যমে) নানান অপ্রমাণিত, বিপজ্জনক কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার অনন্ত সুযোগ করে দেন। সেই সময় থেকেই ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার জন্য ভারতের যোজনা কমিশন ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহায়তায় মার্কিন দেশ ও তার কৃষি-বাণিজ্য সংস্থাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মার্কিন দেশের এই সমস্ত পদক্ষেপগুলোই আজকের কৃষি জ্ঞান উদ্যোগের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

মার্কিন দেশে কৃষি নিয়ে গবেষণা খরচা এবং সময় সাপেক্ষ - তার মূল কারণ কৃষক এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা সেই দেশের মোট জনসংখ্যার এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র এবং দক্ষ মার্কিন প্রযুক্তিবিদদের মাইনে খুবই বেশি। এদিকে মার্কিন দেশ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে পা রাখার আগেই মার্কিন দেশে বসে গবেষণা করে যে সমস্ত কৃষি সংক্রান্ত উদ্ভাবন এবং কৃষি পদ্ধতি-প্রযুক্তি নির্মাণ করেছিলো, বড় মাপের মাঠস্তরের পরীক্ষার সময় দেখা গেলো সেগুলো অকার্যকর, এমনকি কতকগুলো বিপজ্জনকও। কিন্তু মার্কিন দেশের প্রয়োজন ছিলো এই সমস্ত তামাদি পদ্ধতি - প্রযুক্তির পেছনে যে লগ্নী করা হয়েছে তার সুদসহ পুনরুদ্ধার। অতএব নেহরুর তথাকথিত এই সমস্ত "আধুনক প্রযুক্তি"তে আগ্রহ দেখে মার্কিন দেশ এই সমস্ত অপ্রমাণিত, অকেজো এবং বিপজ্জনক প্রযুক্তি ভারতের মাটিতে চালান করার জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা রচনা করে এবং পুরো বিষয়টি একটি পরস্পর সংযুক্ত গুচ্ছ প্রকল্প হিসেবে ভারত সরকারের কাছে তাত্ত্বিক মোড়কে পেশ করা হয়। এই পরিকল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো যে এর প্রকল্পগুলো মার্কিন সরকারের কোনও সরকারি দপ্তর রূপায়িত করবে না - তার বদলে এগুলো রূপায়ণ করবে মার্কিন সরকার অনুমোদিত কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা। আজও সমাপতন - মনমোহন সরকার মার্কিন দেশের সঙ্গে যে কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ সংক্রান্ত চুক্তি করেছেন, সেগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব পাচ্ছে কয়েকটি বেসরকারি বহুজাতিক মার্কিন ব্যবসায়িক সংস্থা।

সিআইএ- নির্দেশিত মার্কিন প্রজন্ম ঃ এক নজরে

নেহরু সরকারের মার্কিন দেশের বেসরকারি ব্যবসায়িক সংস্থাগুলোকে তামাদি হয়ে যাওয়া অকেজো কৃষি প্রযুক্তি ভারতে চালান করার শর্তহীন ছাড়পত্র দেয়; তখন মার্কিন দেশ পার্কার সাহেবকে মার্কিন টেকনিক্যাল কো-অপরেটিভ মিশনের মাধ্যমে প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়।

সেই সময় মার্কিন দেশের কিছু কৃষি-প্রযুক্তি সংস্থা কৃষি ক্ষেত্রে বসেই চট্‌ জলদি চাষের মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার কিছু যন্ত্রপাতি বানিয়েছিলো। কিন্তু সে যন্ত্রগুলোর কলাকৌশল ছিলো সমসাময়িক ইউরোপীয় প্রযুক্তির বা ভারতে যে সামান্য প্রযুক্তিগত গবেষণা হয়েছিলো তার নিরিখে খুবই নিকৃষ্ট মানের। যন্ত্রগুলোর মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া যেতো তাতে ত্রুটির পরিমাণ ছিলো বেশি, তাদের মাপার ক্ষমতাও ছিলো কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জমিতে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় যৌগের বা লবণের পরিমাণ মাপাতে ভুল হতো ১৫-২০ শতাংশ, যা কিনা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে মান্য নয়। অথচ ভারতের কৃষি মাটির জন্য এই সমস্ত বস্তুর পরিমাণ আরও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের প্রয়োজন ছিলো। ফলে উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়া জেলাতে বিপুল পরিমাণে কৃষি জমিতে যখন এই যন্ত্রগুলোর ক্ষমতা পরিমাপ করার চেষ্টা হলো, তখন দেখা গেলো ভারতের মতো দেশে এই যন্ত্রগুলো মাঠস্তরে কাজের জন্য সম্পূর্ণতই অনুপযোগী। কিন্তু কয়েকটি মার্কিন সংস্থা এই খাতে তখনই অনেক লগ্নী করে ফেলেছে; অন্যদিকে জাপান এবং ভারতের অন্তত একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার এমন একটি যথেষ্ট সুবেদী যন্ত্র নির্মাণ করে ফেলেছে। এই দ্বিমুখী আক্রমণের মুখে পড়ে চৌখস একচেটিয়া বেসরকারি পুঁজির তল্পিবাহক পার্কার নেহেরুকে বুঝিয়ে রাজি করান যে

ভারতের জন্য অবিলম্বে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রয়োজন। সারা দেশ জুড়ে অনেক বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ এর বিরোধীতা করেন, সংসদে বড় বড় জোটের প্রতিনিধি কিছু কিছু সাংসদও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধীতা করেন। কিন্তু তখন নেহরুর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, নেহেরুর হাত ধরে দুর্নীতি হচ্ছে, বিজ্ঞান বিরোধী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ তোলা তখন স্পর্ধারই নামান্তর ছিলো। অতএব প্রায় বিনা বাধায় পার্কার সাহেব তাঁদের পরস্পর-সংযুক্ত পদক্ষেপের প্রথমাংশটি সহজেই সম্পাদিত করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় দশাঃ আরও অধীনতা

মার্কিন পরামর্শে ভারত সরকার তখন ফার্টিলাইজার করপোরেশান অফ ইণ্ডিয়া গঠন করেছে এবং পার্কার সাহেবের "সুচিন্তিত" মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি মন্ত্রকের মাধ্যমে এই সংস্থা ভারতের যে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারটি স্বদেশী যন্ত্রপাতি নির্মাণ করছিলো, তাদেরকে সুপারিশ করেছে যে তারা যেন অতঃপর গবেষণা বন্ধ করে মার্কিন বেসরকারি সংস্থা (অর্থাৎ যাদের নির্মিত যন্ত্র কিনতে নেহেরু ছাড়পত্র দিয়েছেন) থেকে প্রযুক্তি আমদানি করে।

মার্কিন অনুদান সংস্থা ইউ এস এ আই ডি (USAID) ভারতের ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়াকে ঋণ দেয়, করপোরেশন অতঃপর সেই ঋণের টাকায় মার্কিন বেসরকারি সংস্থা যা কিনা পার্কার সাহেব ঠিক করে দিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে কোনো দরপত্র ছাড়াই সেই সব অকেজো যন্ত্র বিপুল পরিমাণে কেনে। একমাত্র প্রতিরক্ষা খাতেই ঐ সময়ে এই যন্ত্র কেনার সমপরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল।

কিন্তু মার্কিন সংস্থার প্রয়োজন ছিলো কোনও দামী ছাড়াই ঐ যন্ত্রপাতিগুলোকে কার্যকর নক্সায় রূপান্তরিত করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করা। তখন পার্কার সাহেব আবার নেহরুর মারফৎ মন্ত্রীসভা এবং সংসদকে বোঝাতে সক্ষম হলেন যে ভারতের কৃষি উৎপাদন কম হওয়ার কারণ কৃষি জমির মালিকানা ব্যবস্থার অসাম্য নয়, বরং কারণটা সামাজিক-অর্থনৈতিক হওয়ার পরিবর্তে নিতান্তই টেকনিক্যাল - ভারতের কৃষকের তার জমির উর্বরতা সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

এই বার পার্কার সাহেব ঝুলি থেকে তাঁর দ্বিতীয় প্রকল্পের বেড়ালটি হাজির করলেন। তিনি বললেন যে ফার্টিলাইজার করপোরেশন মার্কিন দেশ থেকে এইমাত্র যে সমস্ত দামি দামি যন্ত্রপাতি কিনলো সেগুলোকে ব্যবহার করে করপোরেশন এখন অনেকগুলো ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার তৈরী করুক। এগুলো সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যাক এবং সারা ভারতের কৃষিক্ষেত্র থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে ভারতের কৃষিক্ষেত্রের জন্য একটা "উর্বরতা মানচিত্র" প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এই মানচিত্র দেখে বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য যথাযথ কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করা সহজ হবে।

পার্কার সাহেব আরও বললেন যে এই ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার নির্মাণ এবং তাকে সুষ্ঠু ভাবে চালানোর জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন এবং সেই দক্ষতা ভারতের প্রযুক্তিবিদদের নেই। যদিও তখনই ভারতের প্রযুক্তিবিদরা দেশীয় কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তিতে মার্কিন দেশকে টেক্কা দিয়ে অনেক উন্নত প্রযুক্তি এবং যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু "আধুনিকতা" -র ভক্ত এবং সাহেবদের কল্পনায় "পারফেক্ট অ্যাংলোফাইল" নেহরু যা কিছু মার্কিন তাতে মজেছিলেন। সঙ্গে ছিলো টাটা বিড়লার মদত, কেননা ঐ যন্ত্র আমদানি করার বরাত কিছুটা পেয়েছিল এই দুই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সংস্থাগুলো।

পার্কার সাহেবের মত মেনে নেহরু তখন বিরাট একদল বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ সঙ্গে এক বিশাল টেকনিক্যাল কর্মীর বাহিনীকে দফায় দফায় মার্কিন মুলুকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। এর ফলে মার্কিন বেসরকারি সংস্থাগুলো বিনা পয়সায় তাদের যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে, ভবিষ্যতে ঐ যন্ত্রগুলো ব্যবহার করে ঐ যন্ত্রগুলোর কার্যকারিতা এবং সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ করতে পারবে, যে তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ঐ সব সংস্থাগুলো আরও উন্নত মানের যন্ত্র উৎপাদন করতে পারবে। দু'বছরে এই প্রশিক্ষণ খাতে ভারত সরকার যতটাকা ব্যয় করে তার মাত্র ৫৩ শতাংশ অর্থ সেই দুবছর ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্মিলিতভাবে পেয়েছিলো।

যে সব বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, আমলা এবং টেকনিক্যাল কর্মীরা মার্কিন দেশে প্রশিক্ষণ নিতে যান, তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ যতটা না ছিলো, তার চেয়েও বেশি ছিলো 'আতিথি সৎকার' ডলার-এ ভাতা এবং মার্কিন দেশে নিয়মিত 'ভ্রমণের টোপ' - অবশ্য যদি তাঁরা ভারতে ফিরে গিয়ে সম্মিলিত ভাবে ঘোষণা করেন যে মার্কিন যন্ত্রগুলো বাস্তবিকই খুবই উচ্চমানের।

ভারতের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ এবং সর্বোপরি কৃষিবিজ্ঞানীরা বারে বারে বলে এসেছেন যে মার্কিন যন্ত্রগুলো নিম্নমানের, তাদের পরিমাপ দক্ষতা ভারতের মাটির জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু মার্কিন প্রত্যাগত বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ-আমলাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের কলরবে বৈজ্ঞানিক সত্য অচিরেই চাপা পড়ে যায়। এই সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টেকনিক্যাল কর্মী এবং প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় এবং ঘন ঘন মার্কিন দেশ ভ্রমণের সুবিধে পাওয়া (সঙ্গে অবশ্যই ডলার-এ ভাতা পাওয়া)

আমলাদের প্রত্যক্ষ মদতে 'ভারত' দেশ গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে কৃষিজমির উর্বরতা পরিমাপের এক মহাযজ্ঞের সূত্রপাত ঘটে।

এই সমস্ত অকেজো যন্ত্র কৃষি জমির উর্বরতা সূচক সমস্ত পরিমাপ গুলো প্রয়োজনীয় সূক্ষ্মতায় করতে অপারগ ছিলো। ফলে একটি সাময়িক পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে এই সমস্ত আমলা বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদরা সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতের কৃষিজমির উর্বরতা কমছে ভয়ানক হারে এর ফলে অচিরেই ভারতকে পুনঃ পুনরায় 'দুর্ভিক্ষের মহাগুন' গ্রাস করবে। বাস্তব অবস্থা কিন্তু মোটেই এতটা হতাশাব্যঞ্জক ছিলো না। ভারতের দেশ প্রেমিক কৃষি বিজ্ঞানীরা যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রকরণ মেনে, অনেক সূক্ষ্ম পরিমাপ করে, সেই পরিমাপকে রাসায়নিক এবং জৈব পরীক্ষা মারফৎ বার বার তার সঠিকতা নিরূপণ করে বলেন যে ভারতের জমির উর্বরতা হ্রাসের কোনও লক্ষণ নেই - যে বিভিন্নতা দেখা যাচ্ছে তা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেরই প্রতিফলন মাত্র।

যে দেশপ্রেমের কথা, স্বাধিকারের কথা নেহরু নিয়মিত তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করতেন, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেলো নেহরুর চৈতন্যে বিদেশ প্রীতি প্রায় স্থায়ী স্থান অধিকার করেছে। ফলে দেশপ্রেমকে বিসর্জন দিয়ে, দেশের বিজ্ঞানীদের ব্যবসাধ্য গবেষণাকে উপেক্ষা করে নেহরু পার্কার সাহেবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে সিদ্ধান্ত করেন যে সত্যিই ভারতের কৃষিজমির উর্বরতা কমছে ভয়ানক ভাবেই। এর ফলে পার্কার এবং তাঁর সহায়ক এবং পৃষ্ঠপোষক মার্কিন বেসরকারি কৃষি প্রযুক্তি সংস্থাগুলো তাদের তৃতীয় প্রকল্পটি ভারত সরকারের কাছে পেশ করে দেয়।

তৃতীয় দশা :

ভারত সরকার যখন জেনেই নিলো যে ভারতের কৃষি জমির উর্বরতার সমস্যাটি এমনই সংকটের রূপ নিয়েছে যে এর ফলে ভারতের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে চলেছে, ঠিক তখনই মার্কিন ইচ্ছার প্রতিধ্বনি করে মার্কিন দেশ ফেরৎ আমলা-বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা নেহরুকে বোঝালেন যে অনুর্বর হয়ে যাওয়া কৃষি জমিকে উর্বর করার জন্য চাই ক্রমাগত বেশি বেশি মাত্রায় রাসায়নিক সারের প্রয়োগ।

এদিকে আরব দুনিয়ার তেলের ভাণ্ডার যে সমস্ত মার্কিন এবং ইউরোপের দুর্বৃত্ত সংস্থাগুলো দখল নেয়, তাদের কয়েকটির আবার কৃষি প্রযুক্তিরও সংস্থা ছিলো। এই সমস্ত সংস্থাগুলোর হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত পেট্রোক্যামিকেল জমে যায়, যা ব্যবহার করে তারা উদ্বৃত্ত রাসায়নিক সার প্রস্তুত করবে। ভারতের মতো এতো বড় একটি বাজার এত সহজে, বিনা প্রতিযোগিতায় দখল করার এমন সুযোগ তারা সহজে এবং সানন্দে গ্রহণ করে। এই সমস্ত সংস্থা মার্কিন দেশ প্রত্যাগত ডাকসাইটে আমলা এবং বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে ভারত সরকারকে সহজেই বুঝিয়ে দেয় যে, যে পরিমাণ রাসায়নিক সারের জোগান থাকলে ভারতের কৃষি জমির অনুর্বর হয়ে যাওয়ার সমস্যার খানিকটাও সমাধান করা সম্ভব, ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতিতে সেই পরিমাণ রাসায়নিক সার উৎপাদনের কোনও পরিকাঠামোই বিদ্যমান নেই। তথ্য হিসেবে বিষয়টি সত্যি ছিলো আবার একই সঙ্গে এটাও সত্যি ছিলো যে ভারতের বিজ্ঞানীরা দেশীয় জ্ঞান এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিন্ধ্রি সার কারখানায় ভারতের মাটি এবং ফসলের উপযোগী, অনেক সস্তা সুষম এক জাতের সার উদ্ভাবন করে তা মাঠ স্তরে পরীক্ষা করে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু এমন আত্মনির্ভরশীলতা মার্কিন সার বিক্রির সংস্থাগুলোর কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। তারা তাড়াতাড়ি নেহরুর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভারতের কৃষি মন্ত্রককে বোঝায় যে তারা প্রথমে ভারতকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার সরবরাহ করবে এবং পরে তারা চড়া হারে সুদের বিনিময়ে ঋণ দিয়ে ভারতে রাসায়নিক সারের কারখানা গড়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন সহায়তায় রাসায়নিক সার কারখানা, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কীটনাশকের কারখানাও ভারতে গড়ে ওঠে। কীটনাশক কারখানার ফলে ভারতের কী দুর্দশা হয়েছে তা মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইড এর ভূপাল কারখানায় দুর্ঘটনার পর নতুন করে কিছু না বললেও চলে। ডবল সুপার ফসফেট জাতের সারগুলো ভারতের সবচেয়ে দূষণ ছড়ানোর কারখানা গুলোর অন্যতম। সার এবং কীটনাশকের প্রভাবে মৃত্যুর হার প্রায় যক্ষার ফলে মৃত্যুর হারের কাছাকাছি। ভারতের সিন্ধ্রি সার কারখানায় যে নতুন ধরনের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় সার উৎপাদন করার গবেষণা চলছিলো, তা কালক্রমে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং মার্কিন দেশের ধাঁচে এখানেও একই জাতের সার উৎপাদনের গবেষণা চালু হয়। ভারত সরকার এই দুই পদক্ষেপ নেওয়ায় মার্কিন দেশের খনিজ তেলের সংস্থাগুলো ভারতে সারা জীবনের জন্য রাসায়নিক সারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, পেট্রোকেমিক্যাল সরবরাহ করার বরাত পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে নিতে সক্ষম হয়।

পার্কার সাহেব ভারতের কৃষির সর্বক্ষেত্রে মার্কিন অনুপ্রবেশ এবং ভারতের কৃষিক্ষেত্রটিকে মার্কিন প্রযুক্তি মুখাপেক্ষী করার কাজটি সম্পন্ন করে অবসরকালীন ভাতা গ্রহণের জন্য মার্কিন দেশে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি এম আইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৌদ্ধিক আলোচনাচক্রে মন্তব্য করেন যে কৃষিক্ষেত্রে ভারতে তাঁর কার্যকলাপকে ভারতের কৃষি মার্কিন ধাঁচে সাজানোর

প্রথম প্রজন্ম-র কাজ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আজ বলতেই হয় যে পার্কার সাহেবের বর্ণনা যথেষ্ট বাস্তবানুগ এবং সত্যাশ্রয়ী ছিলো।

এরপর মার্কিন দেশ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি পুরোপুরি করায়ত্ত করার জন্য তথাকথিত দ্বিতীয় প্রজন্মের কৌশল কাজে লাগানর কথা ভাবে। এই কাজটি করতে গিয়ে প্রথমেই তাদের নজরে আসে যে পার্কার সাহেবের অসামান্য 'সাফল্য'-র মূল চাবিকাঠিটি নিহিত ছিলো তাঁর মার্কিন দেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমলা-বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে। পার্কার সাহেব আবার এই কৌশলটি ধার করেছিলেন ইংরাজ রাজপুরুষ লর্ড মেকলের কাছ থেকে - মেকলে বলেছিলেন যে ভারতে বৃটেনের আধিপত্য স্থাপন এবং তার স্থায়ীত্ব নির্ভর করবে একদল জন্মের দিক থেকে নেটিভ কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে সাহেব প্রস্তুত করার ওপর। শিক্ষা সম্পর্কে মেকলের এই নিদান মেনেই ইংরাজরা এদেশে বোল-বোলাও চালিয়েছে প্রায় দুশতাব্দী।

দ্বিতীয় প্রজন্মের আবাহন ঃ

মার্কিন কৃষি বিষয়ক সমস্ত পদ্ধতিগুলো ভারতের জন্য সুফলদায়ী, এমন মিথ্যা প্রচারকে বিজ্ঞান বলে চালানো সম্ভব যদি একদল 'বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী'কুল ভারতে এই কথাগুলো বারবার বলা শুরু করেন। এর জন্য প্রয়োজন মার্কিন দেশের কাছে সুবিধাভোগী একদল বিজ্ঞানী - আমলা উৎপাদন যারা মেকলের ভাষায় জন্মিতে ভারতীয় কিন্তু চৈতন্যে মার্কিন জাতির প্রতি অনুগত। তাই মার্কিন দেশের প্রয়োজন হয় এদেশেই অমন 'কালা চামড়ার মার্কিনী নাগরিক' উৎপাদনের। তারা ভারতের কৃষির সঙ্গে জড়িত শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষণ প্রণালী, পাঠক্রম, গবেষণা ইত্যাদি সমস্ত কিছু মার্কিন আদর্শের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয় এবং অনেকাংশেই সফল হয়। নেহরু যে মসৃণ পথের উদ্বোধন করেন, পরবর্তী সময়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাকে সম্পূর্ণ রূপ দেন। তাই আজকে যখন মনমোহন আরও দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজটি নিষ্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছেন, তখন তিনি নেহরুর পারিবারিক ঘরাণাকে রূপায়ণ করছেন।

১৯৫২ থেকে যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিলো, ১৯৬৬-১৯৭৭ (মধ্যের জরুরি অবস্থায় তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে) এই দশকে তা প্রায় সম্পূর্ণ হয়। ভারতেই মার্কিন ধাঁচের সংস্থাগুলো চালানোর জন্য মার্কিন দেশ, তাদের ভাষায় "ওয়ান-টাইম ইনভেস্টমেন্ট" হিসেবে ৫০ হাজার কৃষি বিজ্ঞানীকে মার্কিন দেশের বিভিন্ন কৃষি বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার এবং কৃষি বিষয়ক সংস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি দেখা যায় যে ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ এই পঁচিশ বছরে মার্কিন দেশ ভারতের মূলত কৃষি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ৭ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে।

চিনির কেলাস গঠনের জন্য চিনির অতি-সম্পৃক্ত দ্রবণে এক দানা চিনিকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে না দিলে সেই দানার চারপাশ ঘিরে কেলাস গঠনের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়না। সেই চিনির দানা হিসেবে এক্ষেত্রে কাজ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের মার্কিন দেশে শিক্ষা প্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞানীরা। হয়ত ঘন ঘন মার্কিন দেশ ভ্রমণের আশ্বাসবাণীতে, হাত বা ডলার রোজগারের উদগ্র তাড়নায় অথবা স্রেফ মসৃণ 'কেরিয়ার'-এর কথা ভেবেই এই সমস্ত মার্কিন দেশ প্রত্যাগত 'বিশেষজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানী'-বৃন্দ ভারত সরকারকে মার্কিন দেশের এম আইটি ইত্যাদি মান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারের আদলে নানান নতুন সংস্থা খোলার পরামর্শ দেন। ভারত সরকারও, বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত সুপারিশ বিনা আলোচনায় আগাধ-পাশ-তলা গ্রহণ করে। অবশ্য ভারতের শিক্ষাবিদবৃন্দ, এমনকি ভারতের আমলাতন্ত্রে যে বিরল প্রজাতির দেশপ্রেমিকরা তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯৪৭-উত্তর স্বনির্ভর সার্বভৌম ভারত গঠনের স্বপ্ন তখন লালন করতেন, তাঁরাও এমন জনবিরোধী-দেশবিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

সারা ভারত জুড়ে একে একে এই সমস্ত মার্কিনী ধাঁচের সংস্থা গড়ে উঠতে থাকে এবং এই সমস্ত সংস্থার কর্ণধার বা অতি গুরুত্বপূণ নীতি-নির্ণায়ক পদগুলি এই সমস্ত দ্বিতীয় প্রজন্মের মার্কিন দেশ প্রত্যাগত বিজ্ঞানীরা দখল করে নেন। ইনস্টিটিউট অফ ইকনমিক গ্রোথ, কলকাতা এবং আমেদাবাদের ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট সহ নানান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। বলাই বাহুল্য, যে সমস্ত মার্কিন কৃষি সংস্থা এই সমগ্র পরিকল্পনাটি নেপথ্য থেকে পরিচালনা করছিলো, এখন তারা প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষভাবে এবং কিছুটা ফোর্ড ফাউন্ডেসনের মতো আর্থিক সংস্থার মধ্যমে এই সমস্ত সংস্থা স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে ভারত সরকারকে 'সাহায্য' করে।

ভারতের সমস্ত কৃষি বিষয়ক পঠন পাঠন, গবেষণা এবং কৃষি প্রযুক্তি মার্কিনী ধাঁচে বিন্যস্ত করে নেওয়ার পর ভারত সরকার দেশের জন্য কৃষি নীতি তৈরীর কথা ভাবে। যে সব সংস্থা এই কৃষিনীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারতো, সেই সংস্থাগুলোর কর্ণধারবৃন্দ আসলে ঐ দ্বিতীয় প্রজন্মের মার্কিন প্রত্যাগত বিজ্ঞানী এবং আমলাবৃন্দ। ততদিনে বিজ্ঞানী নরম্যান বোরলগ প্রবর্তিত বেঁটে প্রজাতির গম এবং আই আর প্রজাতির "উচ্চফলনশীল ধান" এর বীজ ফিলিপাইনস্ এর ম্যানিলাতে

পরীক্ষমূলক ভাবে সফল হয়েছে বলে দাবি উঠে গেছে। ম্যানিলার ঐ ইন্টারন্যাশানাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটটি আদত্তে ফোর্ড ফাউন্ডেসনের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - তাদের কিছু মেধাসত্বও এই বাবদে তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। ভারতেও ফোর্ড ফাউন্ডেসন অনেক কৃষি সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে সুগঠিত করেছিলো - এই সংস্থাগুলোই আবার ভারতের নয়া কৃষিনীতি প্রণয়নের বিষয়ে নির্ণায়ক ভূমিকা নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলো। ফলে ভারতের নতুন কৃষিনীতি প্রণয়নের কথা যখন উঠল তখন সেই নীতিতে যাতে ফোর্ড ফাউন্ডেসন এবং যে সমস্ত সংস্থা ম্যানিলার ধান গবেষণা কেন্দ্রে বেঁটে এবং উচ্চফলনশীল প্রজাতির গবেষণায় অর্থ লগ্নী করেছিলো, সেগুলো যাতে আগের মতোই বিনা প্রতিযোগিতায় ভারতে মাটিতে সহজেই চালান করা যায় তার ব্যবস্থা করে।

তাই যখন ভারতের জন্য নতুন কৃষিনীতি প্রণয়নের কথা উঠলো তখন এই সমস্ত বিশেষজ্ঞরা কমিটি গঠন করে আমাদের দেশের জন্য মার্কিন দেশের 'নয়া কৃষি প্রযুক্তি' এবং ম্যানিলার 'উচ্চ ফলনশীল বীজ'-এর দ্বারা 'সবুজ বিপ্লব' আমদানির সুপারিশ করে। এই নয়া কৃষিনীতি এবং ভারতের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পঠন পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি এমন ভাবে চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায় যে ভারতের সময়-পরীক্ষিত এবং দেশের মাটি এবং আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেশীয় কৃষি পদ্ধতি একেবারে বানচাল হয়ে যায়।

এই বিজাতীয় এবং উৎকট কৃষি ব্যবস্থা ভারতের বাবু সম্প্রদায় নির্বিবাদে মেনে নিলেও কৃষক সম্প্রদায় তা একেবারেই মানেনি। নিচের তলায় ক্রমাগত বিদ্রোহ এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের ব্যর্থতা পার্কার সাহেবের পরবর্তী প্রজন্মের মার্কিনীদের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। তখন প্রয়োজন হয় তৃতীয় প্রজন্মের দাওয়াই - যেমন রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রথম প্রজন্মের ভেষজ পেনিসিলিন এর পর আমরা আরও উন্নত নতুন ভেষজ উদ্ভাবন করেছি।

তৃতীয় প্রজন্মের দাওয়াই ঃ কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ

প্রতিযোগিতাহীন একচেটিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন পণ্যটি ওপর থেকে ভোক্তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এবং এর ফলে নিচের থেকে যে বিদ্রোহ মাথা তুলবে তাকে সংযত করা। এই দুটি বিষয়কে যত্ন করে হিসেবে রেখে ভারত সরকারকে বাধ্য করার বদলে তাদের স্ব-ইচ্ছায় এবং দেশের আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বিদ্রোহকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে মার্কিন দেশ ভারতের বুকে অতঃপর চালু করলো কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ, যা ইংরাজি নাম 'এগ্রিকালচারাল নলেজ ইনিসিয়েটিভ'-এর আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে, এ কে আই।

এই "জ্ঞান উদ্যোগ" টি আসলে কী?

ভারতে যেমন পাঞ্জাব আজকে রক্তাক্ত, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে খেলাপের পরিমাণ সর্বাধিক, অমৃতসরের ভিক্ষুকের সংখ্যা সারা ভারতের বড় শহরগুলোর মধ্যে সর্বাধিক, ব্যাঙ্কের টলোমলো অবস্থা, এসবই হলো সবুজ বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থা। সবুজ বিপ্লবের স্বপ্ন ঘোড়ার চড়নদার পাঞ্জাব রাজ্যে কৃষি জমির উর্বরতা অস্তমিত, রাজ্যটি গমের নীট রপ্তানীকারক থেকে আমদানিকারকে রূপান্তরিত সবুজ বিপ্লব সাক্ষী হয়েছে এক রক্তলাঞ্ছিত অতীতের' জন্ম দিয়েছে এক রক্তাক্ত ভবিষ্যতের - শীর্ণ, ম্লানমুখ ঋণগ্রস্থ কৃষকদের মিছিলে গ্রাম-শহর একাকার। সারা বিশ্বেই সবুজ বিপ্লবের ক্ষেত্রগুলোর চেহারা গড়পড়তা একই রকম। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের সোনালী হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে নাৎসী জার্মানীর সহায়ক অনেক দুর্বৃত্ত সংস্থাগুলিই সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তিতে মাত্রাতিরিক্ত লগ্নী করে বসে আছে - সেই লগ্নী হারানর ভয়ে তারা চায়না ভারতের মতো একটি কৃষক-ভিত্তিক দেশ সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি বর্জন করুক। তারা তখন মার্কিন দেশ প্রত্যাগত বিজ্ঞানীদের দিয়ে বলাতে শুরু করলো যে এখন ভারতের প্রয়োজন এক "দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব" - যা কেবল কৃষির উন্নতি করবে, উৎপাদন বাড়াবে বহুগুণ, কিন্তু তা " প্রথম সবুজ বিপ্লব"এর ভয়াবহ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত।

কেমন হবে এই তথাকথিত "চিরহরিৎ বিপ্লব"? এই বিপ্লব সম্পন্ন করতে হলে ভারতকে, বিশেষত তার কৃষি খামার গুলোকে বিদেশী-মূলতঃ মার্কিন-কৃষি খমারগুলোর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে হবে। মনমোহন সিং মহাশয় ২০০৫ সালে মার্কিন দেশ ভ্রমণের সময় ইন্দো-মার্কিন পরমাণু চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আধাগোপনে এমন প্রতিশ্রুতি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে দিয়ে এসেছেন - তাকে আইনী শিলমোহর দেওয়ার উদগ্র তাড়নায় তিনি "কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ" চুক্তিটিও সম্পন্ন করে এসেছেন। গ্যাট চুক্তির মতো এটাতেও পুরো বিষয়টি ঘটেছে ভারতের সংসদকে এড়িয়ে গিয়ে। দেশব্যাপী কোনও বিতর্ক ছাড়াই বর্তমান শাসকরা স্ব-ইচ্ছায় দেশের সার্বভৌমত্ব এবং কৃষকদের স্বার্থ একসাথে বিদেশী বানিয়াদের চরণতলে সমর্পণ করে এসেছেন।

কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ কী বস্তু তা বোঝানর জন্য মনমোহন সিং - এর ভারতীয় সংসদে ২০০৫ সালের বিবৃতিই যথেষ্ট ঃ 'ভারতের প্রথম সবুজ বিপ্লবটি প্রত্যক্ষ মার্কিন সহযোগিতায় ঘটেছিলো এবং এর ফলে ভারত খুবই উপকৃত হয়েছে। আমরা মনে করি, কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ বিষয়ে সমঝোতা (এগ্রিমেন্ট অন

এগ্রিকালচারাল নলেজ ইনিশিয়েটিভ) আমাদের দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে এবং মার্কিন সহযোগিতায় আমরা প্রথম সবুজ বিপ্লবের মতোই উপকৃত হবো।"

কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ : বিপদের দিকগুলি

প্রথমত : তিনটি বৈশিষ্ট্যের কারণে এই কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ ভারতের কৃষি কৃষক জনতার জন্য বিপদ সূচিত করছে। এই কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ চুক্তিটির আগে যেকোনও দেশের সঙ্গে ভারতের কোনও চুক্তি বা সমঝোতা সম্পাদিত হয়েছে, তা ঘটেছে দুই দেশের দুটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মধ্যে। অই চুক্তির ফলে সেই মন্ত্রকের অধীনে যা সমস্ত কিছু, সেগুলোই মূলত প্রভাবিত হতো - দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে চুক্তির কোনও প্রভাবই পড়তো না। কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগই বিদেশের সঙ্গে ভারতের প্রথম একটি চুক্তি, যেখানে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে (ভারতের পক্ষে মনমোহন সিং এবং মার্কিন দেশের পক্ষে জর্জ বুশ) সম্পাদিত হলো, ফলে পুরো দেশের সমস্ত ক্ষেত্রগুলো এই চুক্তির আওতাভুক্ত হলো। তার অর্থ হলো ভারতের সমস্ত মন্ত্রক এই চুক্তি মোতাবেক চলতে বাধ্য রইলো, চুক্তির ফলে যদি ভারতের অসুবিধে ঘটে তবে ভারতের নির্বাচিত সংসদেরও এই চুক্তি বাতিলের এক্তিয়ার রইলো না। অর্থাৎ সরকার পরিবর্তন করলেও সেই নতুন সরকার, তারা যতই এই চুক্তির বিরোধী হোক না কেন, তাদের কেও এই চুক্তি মেনে চলতে হবে।

ভারতে বিশ্বায়ন চালু হওয়ার পর মার্কিন দেশ সহ অন্যান্য অনেক দেশের সঙ্গে কৃষি বিষয়েই অনেক দ্বি-পাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলোর অনেক কটাই এখনও চালু অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগই হলো একমাত্র ভারত-মার্কিন কৃষি-বিষয়ক চুক্তি, যার ভিত্তি হলো ব্যর্থ সবুজ বিপ্লব যা ভারতের কৃষিতে স্থায়ী সর্বনাশ ডেকে এনেছে, যার ফলে ভারতের কৃষি এবং কৃষকের ক্ষতির বিনিময়ে মার্কিন বহুজাতিক কৃষি সংস্থাগুলো মুনাফা করেছে, এবং এই চুক্তি সেই মার্কিন দেশ ও প্রায় সেই মার্কিন সংস্থাগুলোর হাত ধরেই প্রবল বিতর্কিত এবং বৈজ্ঞানিক দিকে থেকে অপ্রমাণিত এক দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতের কৃষিকে উন্নত করতে চায়। এই চুক্তি শুধু এই পর্যন্ত গিয়েই থেমে থাকেনি। গ্যাট চুক্তির আদলে এই চুক্তির ধারা মতে (যা কিনা মনমোহন গ্যাট চুক্তির সই দেওয়ার মতোই ভারতের সংসদকে এড়িয়ে গিয়েই চুপিচুপি বিদেশে সেরে এসেছেন) ভারতে সবুজ বিপ্লব আনার জন্য ভারত তার সাংবিধানিক এবং প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর আমূল এবং মৌলিক পরিবর্তন করবে। ভারতের কমবেশি ৫০ টি আইন পরিবর্তন করলে তবেই এই "দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব"-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্ম হবে। তাই ভারতের সংসদে এই ৫০ টি সংশোধনীর ১৭টি ইতিমধ্যেই পেশ হয়ে গেছে - ২০ টির খসড়া বিল আইন কমিশন প্রস্তুত করা শুরু করে দিয়েছেন। খেয়াল রাখা দরকার যে এই কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়টি পার্কার সাহেবের নিদানে অনুপস্থিত ছিলো। কৃষি জ্ঞান উদ্যোগের এমনতর দাবি আজ ভারতের কৃষি ক্ষেত্রের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন উদ্যোগ বিসর্জন দিয়ে তাকে সরলরৈখিক ভাবে মার্কিন দেশের ওপর নির্ভরশীল করে তুলছে। নেহরু বলেছিলেন ভারতের যোজনা কমিশন হলো মার্কিন সেনেটের উপাঙ্গ - আর মনমোহন সারা ভারতকেই মার্কিনীদের অধীনস্থ দেশে পর্যবসিত করলেন!

এই সংস্থার পরিচালন সমিতির সাংগঠনিক রূপ দেখলে মার্কিন দখলদারী চরিত্রটি উদ্ঘাটিত হতে কোনও সময় লাগবার কথা নয়। যে কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ ভারতের "সুবিধার্থে" এহেন "দ্বিতীয় নির্বিষ সবুজ বিপ্লব" আনবে তা মার্কিন দেশের পক্ষ থেকে পরিচালনা করবে মার্কিন দেশের কোনও প্রশাসনিক প্রতিনিধি নয় - করবে কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানার কৃষি ব্যবসায়ী সংস্থা, যথা মনসান্টো, ওয়ালমার্ট এবং ড্যানিয়েল আর্চার সংস্থা। ভারতের জন্যও তেমনি রয়েছে কয়েকটি অখ্যাত, অপরিচিত কিছু ব্যবসায়ী বেসরকারি সংস্থা। আশঙ্কা হয় আই পি এল-এ যেমন অখ্যাত সংস্থার মাধ্যমে আমলা এবং মন্ত্রী মহোদয়গণ বিপুল পরিমাণে ভারতের আর্থিক সম্পদ লুণ্ঠন করেছেন হয়তো বা তেমনি এই সব অনামা, অজানা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কৃষিজ্ঞান উদ্যোগের সমর্থক মন্ত্রী-আমলারা আবার দেশের সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ-এর কৌশল ফাঁদছেন।

কৃষি জ্ঞান - উদ্যোগ যে "অশ্বডিম্ব" প্রসব করবে

যে উদ্যোগের সঙ্গে জ্ঞান কথাটি জড়িত তার কাজ কিন্তু জ্ঞান থেকে কয়েক শত যোজন দূরত্বে, বরং তা বাণিজ্য, মুনাফা এবং জ্ঞানের একচেটিয়া করণের জন্যই নিবেদিত প্রাণ। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই প্রথম তিন বছরের জন্য নিম্নলিখিত খাতে অর্থ বরাদ্দ করে দিয়েছে :

বিষয়	বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
১। শিক্ষা, শিক্ষণ, শিক্ষা বিষয়ে দলিল ও পাঠক্রম প্রস্তুত করা	৬৫
২। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, অনুসারী দ্রব্য ব্যবহার এবং জৈব জ্বালানী	৪৫
৩। জৈব প্রযুক্তি	২১৪.৫
৪। জল ব্যবস্থাপনা	২৫.৫
সর্বমোট বরাদ্দ	৩৫০.০০

কৃষি সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়ে উন্নয়নের ৯ শতাংশ বরাদ্দ ছেঁটে

এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। নাম যদিও যৌথ উদ্যোগ, কিন্তু মার্কিন দেশ প্রথম তিন বছরে এই কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগখাতে এক পয়সাও বরাদ্দ করেনি। অর্থাৎ এখন মার্কিন দেশের পক্ষে উদ্যোগের জন্যও অর্থ জোগাবে ভারতীয় করদাতা জনগণ। "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে" যে চারটি বিষয় কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, সেই চারটি ক্ষেত্রেই ভারতের জন্য অশেষ বিপদের কারণ ঘটাবে।

প্রথমে আমরা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। ঐতিহ্যগত ভাবেই ভারতের কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা এবং কৃষি গবেষণার মৌলিক অভিমুখ ছিলো কৃষক-ভোক্তা কেন্দ্রিক। ভারতের সরকারি কৃষি গবেষণা সংস্থা বা সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ফলে আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি-প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হতো, এযাবৎ কালে সেই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি গবেষণাগার থেকে সরাসরি কোনো আর্থিক লেনদেন ছাড়াই তা চাষীর কাছে পৌঁছে যেত। চাষী তারপর সেই উদ্ভাবনকে বাস্তব অভিজ্ঞতা খাটিয়ে আরও উন্নত করতো এবং তা অন্যান্য চাষীদের সঙ্গে বিনি পয়সায় বিনিময়ও করতো। অর্থাৎ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হতো সামাজিক সম্পত্তি - তা থেকে কেউ ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা সংস্থাগত মুনাফা করতে পারতো না - তা সহজেই পাওয়া যেতো; কোনও গোপনীয়তা বা বাধ্যবাধকতা দ্বারা সেই প্রযুক্তি চালিত হতো না। কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ এতদিন চলে আসা এই সদর্থক, জনমুখী গবেষণার ধারাকে সম্পূর্ণ নঙর্থক এবং জনবিরোধী করে তাকে বিপরীত পথে চালিত করতে চাইছে। কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ মারফৎ এখন থেকে যে সমস্ত নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে তা গবেষণাগার থেকে আর সরাসরি কৃষকের কাছে হাজির হবে না এবং তা আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কৃষকদের সামাজিক সম্পত্তিতেও রূপান্তরিত হবে না এখন এই উদ্ভাবিত প্রযুক্তির আগে পেটেন্ট নেওয়া হবে। পেটেন্ট নেওয়ার পর এই সব প্রযুক্তি (যেমন কৃষি পদ্ধতি, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় বিপনন কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে বিতরণের পরিবর্তে (যেমন এখন কৃষকদের বিনা পয়সায় মিনিকিট সরবরাহ করা হয়) এখন তা যাবে রিটেলার-এর কাছে। এই রিটেলার-রা পেটেন্টের রয়ালটির মূল্য যোগ করে কৃষকদের এই নতুন প্রযুক্তি বিক্রি করবে। বিক্রির সময় না সেই প্রযুক্তির মূল্য নির্ধারণ, না প্রযুক্তি বিক্রির পদ্ধতি বা প্রযুক্তির গুণমান, এইসব বিষয়ে রাষ্ট্রের কোনও নিয়ম, নির্দেশিকা এমনকি দেওয়ানি-ফৌজদারি বিধিও খাটবে না। কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ বোর্ড-এ যে সমস্ত বিদেশী সংস্থাগুলো রয়েছে, তারা নিজেদের মধ্যে এক সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং ভারত সরকার তা শর্তহীনভাবে মেনে নিয়েছে। সমঝোতাটি ঠিক হযবরল-র মতোই। ভারতের মাটিতে ভারতের বিজ্ঞানীরা, ভারতীয় করদাতাদের অর্থ ব্যয় করে ভারতের কৃষকদের জন্য যে সমস্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবেন তার পেটেন্ট করার একমাত্র এবং একচেটিয়া অধিকারী হবে মনসান্টো সংস্থা - ভারত সরকার অথবা ভারতীয় কোনও গবেষণা সংস্থা নয়। যে সব রিটেলার-রা এই সমস্ত প্রযুক্তি বিপনন করবে তারা হলো ওয়ালমার্ট এবং ড্যানিয়েল আর্চার সংস্থা-কোনও ভারতীয় সংস্থা এই কাজ করতে চাইলে তা হবে আইনত দন্ডনীয় অপরাধ (যে ১৭টি আইনের সংশোধনীর কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এটি তার একটি)। তাহলে বিষয়টি দাঁড়ালো এই রকম যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বেগার খেটে মানসান্টোর জন্য মেধাসত্ত্ব বানালেন, আর ভারতীয় কৃষকরা সেই মেধাসত্ত্বের দাম দিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন খরিদ করে ড্যানিয়েল আর্চার এবং ওয়ালমার্ট-এর মুনাফায় সহায়তা করলেন। ঠিক এই বিষয়টিই মার্কিন দেশের রাজধানীতে গিয়ে মনমোহন সিং সাক্ষর করে এসেছেন!

কৃষি শিক্ষা, পাঠক্রম এবং শিক্ষণ প্রণালীর বিষয়টি আরও চমকপ্রদ। ভারত এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে মনসান্টোর যে নানা সমস্যা উপস্থিত হচ্ছে তার নিরসনের উদ্দেশ্যে গবেষণা চালানোর জন্য মনসান্টো ভারতে প্রাইভেট-পাবলিক-পার্টনারশিপ পি পি পি ভিত্তিতে এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়বে। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রম, পঠন-পাঠন এবং গবেষণা চালাবে মানস্যান্টোর নির্দেশিত পথে, এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সর্ববৃহৎ অংশ থাকছে মনসান্টোর হাতে। ক্ষুদ্রঅংশের বৃহৎ অংশ পাচ্ছে ভারতের কিছু কিছু ফড়ে সংস্থা (যেমন টাটা-বিড়লা-আম্বানী-গোয়েঙ্কা-নেউটিয়া প্রমুখ), কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারের হাতে থাকছে মালিকানার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু ফড়ে সংস্থাগুলো যাতে এই উদ্যোগে ব্যাঙ্ক ঋণ পায় তার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার (যেখানে যে অংশীদার) জামিনদার হতে বাধ্য থাকবে। এ যেন সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির আমলের হরির লুঠ আর কি। ভারতে ইতিমধ্যেই বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৭টি পরিবর্তনের আর একটি) পাশ হয়েছে; পশ্চিমবঙ্গে ধীরুভাই আম্বানী তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তারা শোনা যাচ্ছে-ওয়ালমার্টএর একটি তথ্য প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানের বরাতও পেয়েছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের যে নিদান কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ সামনে এনেছে, সেখানেও এই জনবিরোধী সার্বভৌমত্ব বিরোধী বিপরীত যাত্রার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভারতে এতদিন পর্যন্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের যে পদ্ধতি চালু ছিলো (যা কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ বাতিল করেছে)

তাতে মুনাফার বেশির অংশটাই যেতো প্রাথমিক উৎপাদনকারী কৃষকের হাতে। এমনকি ব্যর্থ সবুজ বিপ্লবের সময় যখন সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাটাই ছিলো প্রাথমিক উৎপাদনকারী কৃষকদের বিপক্ষে, তখনও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের ফলে জাত মুনাফার বেশি অংশটা পেতো প্রাথমিক উৎপাদনকারী কৃষক। কিন্তু কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ চাইছে প্রাথমিক উৎপাদনকারী কৃষকের মুনাফার সিংহভাগ যাক প্রক্রিয়াকরণকারী বহুজাতিক মার্কিন সংস্থাগুলোর হাতে। এছাড়াও কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ চুক্তি চাষ ও দাদন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণযোগ্য খাদ্য উৎপাদনের সুপারিশ করেছে। এই দাদন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণযোগ্য কৃষিপণ্য নীলের চাষ করে বাংলার চাষীর ট্র্যাজেডি আজ ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় - একবিংশ শতাব্দীতে সেই ট্র্যাজেডি পুনর্বার ঘটতে চলেছে এই কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগের হাত ধরে। "আধুনিকতা"-র নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনেক এগিয়ে নেই। মনমোহন যে বিষয় আগামী কাল ভাবেন, আমাদের বাম সরকার তা ভেবেছেন গত কাল - তাই কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগের বহু আগেই মার্কিনদের সুপারিশ মত তাঁরা হুগলী ইত্যাদি জেলাতে চুক্তি চাষ ও দাদন চালু করেছেন। ফলতঃ কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগের অনেক উদ্যোগই পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত হবে।

২০০৫ সালে কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ বোর্ড-এর যে প্রথম সভা হয় তাতে মনসান্টো, ড্যানিয়েল আর্চার এবং ওয়ালমার্ট এর প্রতিনিধিরা স্পষ্ট ভাষায় বলে যে ভারতের মতো গবেষণায় উন্নত দেশগুলো কৃষিগবেষণার মাধ্যমে তাদের কৃষি সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করে ফেলেছে - তাহলে তো এই সমস্ত সংস্থা তাদের বহুমূল্য প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ভারতে বিক্রি করতে পারবে না। ভারতকে এই সব গবেষণা বন্ধ করতে হবে এবং এখন থেকেই মনসান্টোর কাছ থেকে ভারতকে "উন্নত" ফলে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে রাখা দামে কৃষি প্রযুক্তি খরিদ করতে হবে!

মনে রাখা দরকার যে ভারতে যে সংখ্যার কৃষক সরকারি কৃষি সাহায্য এবং সরকারি গবেষণাগারের বিভিন্ন কৌশলের ওপর নির্ভরশীল তার পরিমাণ হলো ৭০ কোটি, মার্কিন দেশে সেই সংখ্যাটা মেরে-কেটে ৭ লক্ষ। মনসান্টো তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে এবং, স্পষ্ট করে বললে, ভারতের কৃষকদেরকে তাদের আকেজো এবং বিপজ্জনক প্রযুক্তির লক্ষ্যবস্তু করে তুলেছে। বস্তুত, সারা তৃতীয় বিশ্বের অবস্থাই এই রকম, কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা প্রচুর। মনসান্টোর উদ্দেশ্যও তাই এদেরকে তার কৃষিপণ্যের বাজারের ভেতরে নিয়ে আসা। মনসান্টো কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ মারফৎ যেমন তার পণ্য একচেটিয়াভাবে ভারতের বাজারে আনবে, তেমনি ওয়ালমার্ট এবং ড্যানিয়েল আর্চার সংস্থা, সেই একই কৃষি-জ্ঞান উদ্যোগ মোতাবেক মনসান্টোর ঐ সমস্ত অপ্রমাণিত কৃষি প্রযুক্তি এবং পণ্য একচেটিয়াভাবে ভারতের বাজারে বিপনন করবে। বস্তুত, ২০০৫ এর কৃষি জ্ঞান উদ্যোগের বোর্ড মিটিং-এই ওয়ালমার্ট বলে দিয়েছে যে এই বোর্ড-এ তাদের জোরালো উপস্থিতির জন্য তারা কৃষি রিটেল ব্যবসায় তাদের "একচেটিয়া উপস্থিত" (monpolistic presence) নিশ্চিত করবে।

ভারতের কৃষি মন্ত্রকের কিছু কিছু বিজ্ঞানী-আমলার ভারত সরকারের মার্কিন সরকারের কাছে এমন নিঃশর্ত আত্মনিবেদন ভালো লাগেনি। তারা ২০১০ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে একটি হিসাব প্রকাশ করেছে। তাদের হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারত এ পর্যন্ত এই কৃষি জ্ঞান উদ্যোগ খাতে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা এখনই খরচা করে ফেলেছে। চুক্তি মোতাবেক মার্কিন সরকারের একই সময়সীমায় সম পরিমাণ অর্থ খরচ করার কথা ছিলো - কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত এক পয়সাও খরচ করেনি। শুধু তাই নয় - ভারতের গবেষণাগারে, ভারতের অর্থে, ভারতের গবেষণাগারের পুরো পরিকাঠামো এবং ভারতের বিজ্ঞানীদের ব্যবহার করে মনসান্টো তিনটি পেটেন্ট-এর আবেদন করেছে, এই পেটেন্টগুলোর কাজ হয়েছে কৃষি জ্ঞান উদ্যোগের অংশ হিসেবে।

ড্যানিয়েল আর্চার সংস্থাও পেছিয়ে নেই। মনসান্টো-র জোগাড় করে দেওয়া "উচ্চফলনশীল গম" (হয়ত বা তা জীবপ্রযুক্তি জাত!) ভারতের জন্য আমদানি করেছে, পরিমাণটা ২২ কোটি টন - দাম পড়েছে আন্তর্জাতিক দরের প্রায় তিনগুণ। এই আমদানি করা গমের ১০ শতাংশ গম গেছে পাঞ্জাবে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি কেননা "প্রথম সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থল" এই পাঞ্জাবকে খাওয়ানোর জন্য রাজ্যের বাইরে থেকে গম সহ নানান খাদ্য আমদানি করতে হয়।

বিটি বেগুন কাণ্ড খুবই পরিচিত। হুগলি জেলায় বেআইনীভাবে বিটি বেগুনের যে চাষ চলছিলো তার পেছনে আর্থিক মদত ছিলো ওয়ালমার্ট-এর। বিটি বেগুন ছাড়াও ভারতের মানুষের খাদ্যতালিকাভুক্ত আরও প্রায় ৭০টি খাদ্যবস্তু নিয়ে মনসান্টো গবেষণা চালাচ্ছে - তাদের উদ্দেশ্য হলো এই সমস্ত খাদ্যশস্য-র বীজগুলোকে পেটেন্ট করা। এর ফলে খোলা বাজারে এদের দাম বাড়বে। পেঁয়াজের বর্তমান সংকটের পেছনে এই কৃষিজ্ঞান উদ্যোগের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। দেশী জাতের পেঁয়াজের বীজ তৈরী ভারত সরকার ২০০৯ থেকে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে, এই

কারিকুরির ধনধান্য

শিবপ্রসাদ নিয়োগী

ভারত কৃষি সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যাকে খাদ্য জোগানোর দায় তার ওপর। "সবুজ বিপ্লব" এর প্রেরণাজাত উচ্চফলনশীল শস্য গুলোর চাষ জমির উর্বরতা এতটাই কমিয়ে দিয়েছে যে, কৃষিক্ষেত্রে নতুন সার ও কীটনাশক ও জলের জন্য খরচ প্রচুর বেড়ে গেছে। সবটাই কৃত্রিম ব্যবস্থা -- জমির আর নিজেকে সারিয়ে নেবার, উর্বর করার প্রাকৃতিক শক্তি নেই। প্রথম সবুজ বিপ্লবের জাদুকরী সাফল্য মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই সময়ে কৃষি ও খাদ্য ব্যবসায় যুক্ত বহুজাতিক কোম্পানীরা ভারতের মত বিপুল সম্ভাবনাময় বাজার দখল করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের এজেন্ট, সাদা বাংলায় দালালেরা সর্বত্র বিরাজমান। তাই কী সরকারী গবেষণাগারে বেসরকারি কোম্পানীর জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (GM) ধানের কার্যকারিতা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়? হচ্ছে -- পশ্চিমবাংলাতেই। চুঁচুড়ার "রাইস রিসার্চ স্টেশন" বা RRS-C তে GM ধানের পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের "জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি" বা GEAC।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হবার আগেই GM ধানের গুণগান গেয়ে ফেলেছেন ঐ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত এক বিজ্ঞানী। আগ্রহ টা যে কার বেশী, বোঝা দায়। তিনি নাকি জানিয়েছেন এই GM ধান আয়রন ও ভিটামিন সম্বৃদ্ধ। সুতরাং ভারতের মত গরীব দেশের অপুষ্টিতে ভোগা আমজনতার পক্ষে এটা খাদ্যও বটে, ওষুধও বটে। তাঁকে প্রশ্ন, ঐ চালের ভাত খাবার আগে কী রক্তে হিমোগ্লোবিন টেষ্ট করতে হবে? ঐ ভাত খেতে খেতে কত দিন পর পর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার? বিজ্ঞানী মহোদয় নিশ্চিত জানেন যে বেশি মাত্রায় লোহা বা আয়রণ শরীরে কোনও রোগ উপসর্গ সৃষ্টি করবে না? লোহার যে কোনও যৌগই যে দেহের রক্তাল্পতা সারানোর কাজে লাগেনা, নিশ্চয় তিনি এটাও জানেন। অতীতেও দেখা গেছে কোনও কোনও গবেষক কর্তাভজনা করতে করতে ভুলেই গেছেন তিনি একজন 'বিজ্ঞানী', একজন যুক্তিবাদী মানুষ। সেলসম্যান নন।

উচ্চফলনশীল শস্য ও সবজি উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং -এর ব্যবহার কৃষি ব্যবস্থাটাকেই করপোরেট ও বৃহৎ পুঁজির নিয়ন্ত্রণে আনতে শুরু করেছে। বীজ, সার, কীটনাশক এমন কি কৃষিজাত পণ্যের বাজার সব কিছুর জন্যই চাষীকে পুরোপুরি ঐ কোম্পানী গুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে নিজের জমি থাকা সত্বেও তারা হয়ে উঠবেন ঐ কোম্পানীগুলোর অনুগ্রহপ্রার্থী। এ ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা দরকার।

পৃথিবীর সব দেশেই উন্নত প্রজাতির শস্য ও সবজি বানানোর প্রচেষ্টা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। এই অগ্রগতি ধীরে ধীরে, অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। এটা হয়েছে কৃষিজীবী মানুষের প্রচেষ্টায় — ফলিত জ্ঞানে। দেশে দেশে যে সব দেশীয় (Indigenous) প্রজাতির শস্য ও সবজি এর ফলে উৎপাদিত হলো - সেগুলো প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সার, কীটনাশক প্রভৃতির ওপর নির্ভরতা খুবই কম। অথচ তারা তেমন "উৎপাদনশীল" নয়। হঠাৎ করে উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা কম। বছরের সবসময় তাদের চাষ করাও যায়না। নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আর্দ্রতা অর্থাৎ নির্দিষ্ট মরশুমে এই সব শস্য ও সবজির জীবনকাল অতিবাহিত হয়।

উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রয়োজন কিন্তু দেখা দিল আধুনিক সময়ে - জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। কৃষিক্ষেত্র থেকে গবেষণাগারে চলে এল কৃষি সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা। ততদিনে মেন্ডেলের তত্ব আরও ভালভাবে বোঝা গেছে। জানা গেছে জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো কোড বা সংকেত হয়ে ধরা থাকে তাদের নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে উন্নত জীবে থাকে ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা DNA। আর জানা গেল DNA-র অনুসজ্জার ধরনই হলো "জিন"। পরপর হাজারো 'জিন' থাকে DNA সূত্রের মধ্যে। 'জিন' গুলিই ঠিক করে তার জীবনসঙ্গী - অর্থাৎ কোন প্রজাতির জীবের সঙ্গে তার যৌন মিলন সম্ভব। ভিন্ন ধর্মী জিন সমন্বিত জীবের মধ্যে যৌন সংযোগ হয় না - তাদের বলে Incompatible। যৌন সংযোগ ঘটলে তবেই জিনের আদান প্রদান ঘটতে পারে, যা অপত্য বংশে (Next Generation) প্রবাহিত হয়। গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা এই আপাত 'ইনকম্পেটিবল' প্রজাতিগুলোর মধ্যে 'জোর করে বিয়ে' দিলেন। তার ফলে উৎপন্ন হলো নানা গুণ সম্পন্ন সন্তান প্রজাতির। ধরা যাক প্রচলিত একটি গমের প্রজাতি রোগ প্রতিরোধ শক্তি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু তার ফলন ছিল কম। আর একটি বন্য

প্রজাতির গম (Wild variety) যার ফলন খুব বেশি (আগাছার মত) কিন্তু রোগ প্রতিরোধ শক্তি কম, এই দুই-এর মধ্যে যদি দেখা যায় যে ফলন বাড়ানোর ও রোগ প্রতিরোধের জিন বা জিন সমষ্টি "প্রবল" বা "ডমিনেন্ট", তা হলে তাদের মিলন ঘটাতে পারলে যে অপত্য উদ্ভিদ জন্মাবে তারা রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। এই 'ক্রস ব্রিডিং' বা সংকরায়ণ বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ঘটানোর পর অনেকগুলো ভাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা যায় অপত্য উদ্ভিদে। এই সংকরায়ণের ফলে যে ঘটনা জিন স্তরে হয় তাকে বলে 'জেনেটিক হাইব্রিডাইজেশন'। এছাড়াও সরাসরি জিন সজ্জায় সার্জারি না করে নিয়ন্ত্রিত মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা হয়। মিউটেশন এর ফলে কী ঘটল, তা দেখার জন্য ঐ প্রজাতিটিকে "এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ডে' ফলিয়ে দেখা হয়। যে অপত্য উদ্ভিদে ভালো গুণ এসেছে তাদের মধ্যে ঘটানো হয় পরাগযোগ। কয়েক প্রজন্ম পরে - উৎপন্ন হয় একটি স্থায়ী উন্নত প্রজাতি।

সংকরায়ণ কিন্তু তথাকথিত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নয়। এখানে দুটি প্রজাতির মধ্যে 'যৌন' সংযোগ ঘটানো হয় কৃত্রিম ভাবে। সূক্ষ্ম বা প্রযুক্তি নির্ভর নয় এই প্রক্রিয়া - খরচও কম।

অন্যদিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো প্রজাতিটির জিনসজ্জায় সরাসরি হস্তক্ষেপ (হাত দিয়ে নয়)। এটা কী ভাবে সম্ভব হয়েছে তা বলছি, সংক্ষেপে। গবেষণাগারে প্রজাতিটির জিন সজ্জার মানচিত্র ছকে ফেলা হয় কোথায় কোন্ জিন আছে, কী তাদের বৈশিষ্ট্য সব (সত্যিই 'সব' হয় কি?) বের করে আনা হয়। এই পদ্ধতির নাম ডি এন এ সিকুয়েন্সিং। এই সিকুয়েন্স বা সজ্জাক্রম কমপিউটারে ভরে নিয়ে অনেক "ভারচুয়াল" অদল বদল ঘটিয়ে দেখা যায়। তারপর হয় আসল অদলবদল।

জিনগুলো যেন এক একটা পুঁতি - যা মালা থেকে কেটে নেওয়া যায়। কেটে বাদও দেওয়া যায় (যদি 'খারাপ' জিন হয়)। আবার অন্য কোনও প্রজাতির 'ভাল' জিন এনে আমাদের দরকারি প্রজাতিটির জিন কাঠামোর মধ্যে ঢুকিয়েও দেওয়া যায়। কোনও একটি বা দু একটি জিন কে এভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে নেবার মত করে কাটাকে বলে "স্প্লাইসিং"। এই কাটা ও জোড়া লাগানো জিন নিয়ে গড়ে ওঠা প্রজাতিটিই আজকের পরিভাষায় জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বা GM প্রজাতি. দারুন ব্যায় সাপেক্ষ এই গবেষণা ও প্রযুক্তি

এখন মজাটা হচ্ছে, এই 'হাঁসজারু' প্রজাতিটি আদৌ 'মঙ্গলজনক' হল, নাকি কালক্রমে "বিষশস্য' হয়ে উঠবার সম্ভবনা সম্পন্ন হল - তা বোঝার জন্য তো দরকার দীর্ঘকালীন পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণাগারে তথা ফ্যাকটারিতে বিশাল লগ্নি করে ফেলা মনসান্টো বা জিনোমিক্স-এর মত করপোরেট মহাজনদের অত সময় নেই। তারা চায় 'রিটার্ন'। লগ্নির চেয়ে অনেক অনেক গুণ টাকা — পারলে অনন্তকাল ধরে।

অথচ GM প্রজাতিগুলোর কোনও ট্রায়াল না দিয়ে, দেশে দেশে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। শত হলেও 'স্বাধীন ও সার্বভৌম' সরকার থাকে অনেক দেশে। দেশে থাকে নানান আইনকানুন। তাই GM-কে 'পাশ' করে আসতে হবে। ভারত সরকার অবশ্য নিজের (অর্থাৎ জনগণের) টাকায় পরিচালিত গবেষণাগার খুলে দিয়েছেন। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর খাতিরে তাদের GM প্রজাতির পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে সরকারি গবেষণাগারেই। এটাও অবশ্য ঠিক, এর ফলে পরীক্ষার ফল জানার অধিকার আমরা পাবো। সংস্থাগুলো নিজেরাই পরীক্ষা করলে তার ফল কী হত বলাই বাহুল্য।

ভারতেও বিটি কটন - এর চাষ গবেষণাগারের ছাড়পত্র পেয়ে ফলিত রূপে মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে তুলোচাষীদের সর্বনাশ করে ছাড়ছে। তার বিবরণ 'বি ও বি' - র আগের কিছু সংখ্যায় পাওয়া যাবে। রোগ প্রতিরোধে সক্ষমতার দাবি নিয়ে এসেছিল বিটি কটন। আজ সেই তুলোচাষ প্রবলভাবে কীটনাশক নির্ভর। অন্যদিকে বিষম পরাগসংযোগের ফলে দেশীয় তুলোর প্রজাতিগুলোও সংক্রামিত হয়ে পড়ছে। চাষিদের এতটা সর্বনাশ করার পর, মনসান্টো স্বীকার করেছে যে বিটি-কটন "পিঙ্ক বল ওয়ার্ম" নামক রোগ পোকার আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না। চমৎকার! বিক্রির সময় ঐ পোকার দমনকেই বিটি কটনের সবচেয়ে বড় গুণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

বিটি কটনের এই হাল দেখেই হোক, ভারত জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ ওঠার জন্যই হোক বা নিজের দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেই হোক ভারতের পরিবেশমন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশ "বিটি বেগুন" - এর পরীক্ষার ওপর দু বছরের স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। এটা আমাদের মনে একটা ভাল ধারণা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বোঝা গেল করপোরেট দুনিয়ার চাপ অত সহজে প্রতিহত হবার বিষয় নয়। হাজার হাজার কোটি ডলার লগ্নি হয়ে আছে। তা উদ্ধারে তো মালিকরা মরীয়া হবেই। তাই এবারে একেবারে গোড়ায় আক্রমণ। ভারতের প্রধান খাদ্য শস্য ধান-এ। বিটি কটনের মত যদি গবেষণাগার থেকে "পাশ" করে বেরিয়ে আসতে পারে "বিটি ধান", তাহলেই চরম বিপদের মুখে পড়বে ভারতের

কৃষিক্ষেত্রে। কারণগুলো সহজেই অনুমেয়। এক তো মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের ওপর এই ধান থেকে উৎপন্ন চাল কী প্রভাব ফেলবে তা বুঝতেই পার হয়ে যাবে অনেক দিন - হয়ত একটা গোটা দশক। ততদিনে ঘটে যেতে পারে অনেক সর্বনাশ। এর সম্ভাবনা কিন্তু সত্যিই আছে। ব্যাসিলাস বা ওই ধাঁচের থুরিনজিয়েনসিস ব্যাকটেরিয়ার টক্সিন বা বিষ উৎপাদনকারী জিনকে এনে এই ধান বা বেগুন বা তুলোর জিন সজ্জায় ঢোকানো হয়েছে। এরই নাম 'বিটি ধান', 'বিটি বেগুন' বা 'বিটি তুলো'। ঐ বিষ কতটা পোকা স্পেসিফিক অর্থাৎ নির্দিষ্ট রোগ পোকার ওপরই ক্রিয়াশীল তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। মানুষের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এর ফলাফল কী তাও কি দেখা হবে চুঁচুড়ার গবেষণাগারে? কারা হবেন গিনিপিগ? নিশ্চয়ই ঐ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা বা করপোরেট মালিকেরা নন। সম্ভবত সস্তায় রেশনের চাল পাওয়া দরিদ্র জনগণ। নাকি মানুষের বদলে অন্য প্রাণীর ওপর প্রভাব দেখে, তাকেই পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বলে চালানোর চেষ্টা হবে? সবটাই ধোঁয়াটে। সুতরাং জনস্বাস্থ্যের ওপর এমন প্রভাবসৃষ্টিকারী GM ধান যদি ভবিষ্যতে বাজারে ছাড়া হয়, তার আগে সমস্ত গবেষণা প্রক্রিয়াটি জনসমক্ষে আনতে হবে।

আশার কথা সারাদেশে এই GM কৃষিপণ্যের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। হাতেনাতে কুফল পাওয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কৃষকসমাজ প্রবল বিক্ষোভ জানিয়েছেন। দেশের বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীবর্গও এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছেন। তারা বলছেন প্রথম সবুজ বিপ্লবের থেকেও ভয়াবহ ফল নিয়ে আসবে GM-পন্থবাহী "দ্বিতীয়" সবুজ বিপ্লব। 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' - এই নামটি চাউর করার একটা চেষ্টা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। জাতীয় কর্মসূচী হিসেবে যদি যেন 'ব্যানার' হাজির করা যায় তো এক ঢিলে বহু পাখি মারা যাবে। তখন ধান, গম, টমাটো, সবজি, পোলট্রি সবেতেই GM পন্থ একচেটিয়া ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। মনসান্টো, BASF, ওয়াল মার্ট সিনজেন্টা, বেয়ার-সব বহুজাতিক কৃষি ও খাদ্য ব্যবসায়ীরাই এই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব বা চিরহরিৎ বিপ্লব বা ঐ ধরনের (গোলাপ কে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গোলাপ তো গোলাপই) প্রক্রিয়া লাভ করার জন্য লবিইং অব্যাহত রাখবে, এ ব্যাপারটা হলপ করে বলা যায়।

এর বিপরীতে এখন দরকার আরও জনসচেতনতা। বিশেষ করে যারা এর সরাসরি প্রভাবের মধ্যে পড়বেন সেই কৃষিজীবীদের জানকারি বাড়াতে এগিয়ে আসতে হবে বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীদের। আমাদের রাজ্যে "টিচার্স অ্যান্ড সাইন্টিস্টস্ এগেনস্ট্ ম্যালডেভলপমেন্ট (TASAM) 8 লেনিন সরনী কলকাতা - 13", "ফোরাম এগেনস্ট্ মনোপলিস্টিক অ্যাগ্রেশন (FAMA)" 266/1 সি আই টি স্কিম- 6, কলকাতা -54, এই সব ব্যাপারে চর্চা, তথ্যানুসন্ধান, প্রচার ও আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছেন। গত ১৪ জানুয়ারী টাসাম ও ফামার উদ্যোগে অন্যান্য বহু সংগঠন চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সময় গবেষণা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী জানান যে GM ধান গবেষণার কাজ এখনও কিছু শুরু হয়নি। তিনি আরও জানান যে তাঁর কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক প্লটের চারদিকে ছাড়ার মত জমিই নেই, সে কথা তিনি উপর মহলে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই অন্যত্র করার চেষ্টা হবে। সুরক্ষাবিধি ফাঁকি দেবার চেষ্টা হবে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো মরীয়া ঠিকই। কিন্তু তারাই যে সরাসরি জিতে যাবে - ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অতটা খারাপ নয়। তথ্য জানার অধিকার এবং এ দেশের অনেকটাই মুক্ত সংবাদ মাধ্যমকে যদি সফল ভাবে সঙ্গী করতে পারেন ঐ বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীরা তাহলে জোরদার প্রতিরোধ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। ভারতের পরিবেশ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্তও পরিবেশ ও সমাজকর্মীদের ভরসা দিয়েছে। তবে পরিবেশ মন্ত্রকের ওপর বা জয়রাম রমেশের ওপর ভরসা করে থাকলে চলবে না, এটা সকলেই বোঝেন। কিন্তু সরকারী স্তরে সবটাই খারাপ, সব প্রগতিশীল চিন্তার উৎস "বাইরে", তা যদি না ভাবা হয়, তবে প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও অনেক চিন্তাশীল, অনুভূতিসম্পন্ন বন্ধু আমরা পেতে পারি।

এই বিরাট করপোরেট শক্তিকে সামলাতে সর্বস্তরে, যেখানে যতদূর সম্ভব, ঐক্য ও সমন্বয় গড়ে তোলা দরকার।

এক সফল ছাত্রের কাহিনী

রবীন চক্রবর্তী

আমাদের দেশেরই দরিদ্র পরিবারের একটি ছাত্র নিজের চেষ্টা ও উদ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনে কোথায় পৌঁছতে পেরেছে তার কাহিনী এটি। তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার মান্নারাকয়েল গ্রামের ছয় সদস্যের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি হঠাৎ-ই মারা গেল মাত্র ৪৫ বছর বয়েসে। ঘরে স্ত্রী আর চার সন্তান। সব থেকে বড় ছেলের বয়স বারো। অথৈ জলে পড়লেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। মাস গেলে আয় বলতে দাঁড়াল পারিবারিক পেনশনের চার'শ কুড়ি টাকা। একটি কোঠা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন ওঁরা। কিন্তু এই আয়ে সেই বাড়িতে থাকা সম্ভব হল না। উঠে যেতে হল একটি কুঁড়ে ঘরে। পিছু নিল অভাব। সময়ের সঙ্গে ঘরের জিনিষপত্র বিকিয়ে যেতে লাগল। এক সময় চলে গেল খাবারের থালা বাসনও।

এরই মধ্যে একটি বিলাসিতা ছাড়তে পারলেন না ক্লাস এইট অবধি পড়া চার সন্তানের মা'টি। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার জেদ ধরলেন। পড়শিদের অনেকেরই পরামর্শ ছিল ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে অর্থব্যয় না করে দোকানে-টোকানে কাজে লাগিয়ে দেওয়া। মহিলাটি সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করেছিলেন। কুঁড়ে ঘরে বাস, সেখানে জল বিদ্যুৎ এসব থাকার কথা নয়। ছেলেমেয়েদের রাতের পড়াশুনো রাস্তার লাইট-পোস্টের আলোতে চলতে থাকে। কেরসিনের বাতি জ্বালানর খরচ বাঁচে। একসময় বড় ছেলে মাধ্যমিক পাশ করে।

গ্রামের লোক খুশি। সবাই বলল, এবার টাইপ আর শর্টহ্যান্ড ক্লাশে ভর্তি হয়ে যাক ছেলে। যাহোক একটা চাকুরি জুটে যাবে তা'তেই। কিন্তু ইতিমধ্যে মায়ের সাথে ছেলেও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। সে পড়াশুনো চালিয়ে যাবে ঠিক করল। মা'ও তাই চান। একটা কথা মাঝেমধ্যেই বলতো সে মাকে -'দেখো, একদিন এত টাকা রোজগার করে এনে দেব যে তুমি রাখার জায়গা পাবে না। কেন এমন কথা বলতো সে, কে জানে? -কথা শুনে মা হাসতেন।

উচ্চমাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট করল ছেলে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং দুটোতেই চান্স পেয়েছে। এবার কি করা? মেডিকেল পড়লে নিজের জেলাতেই থাকা যায়। আর ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেলে যেতে হবে চেন্নাইতে। সেই হিসেবে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়াটাই ঠিক। ছেলেটি কিন্তু এতদিন মনে মনে বাইরের দুনিয়াটা দেখার ইচ্ছা পোষণ করে এসেছে। সেই সুযোগ এখন উপস্থিত। সেটা গ্রহণ করা উচিত মনে করল। মা'কে জানাল সেকথা। মা আপত্তি করলেন না। মান্নারাকয়েল গ্রামের কল্যান রমন শ্রীনিবাসন চলে গেল চেন্নাই। আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে।

কিন্তু অভাব পিছু ছাড়লো না। যদিও স্কলারশিপের ভরসায় সেখানে যাওয়া, কিন্তু সে টাকা আসার সময়ের ঠিক নেই। হস্টেলের মেসে টাকা বাকি পড়ে। তখন মেসের খাবার বন্ধ। বন্ধুবান্ধবরা সাহায্য করে। কিন্তু কতদিন আর চলে সেভাবে। ফলে মাঝেমধ্যেই উপবাসে থাকতে হয়। উপবাসে থাকা অভ্যাস হয়ে যায়। কলেজের শেষ সেমেস্টারের শেষ পরীক্ষার আগে টানা দেড় দিন উপবাসে কাটাতে হয়েছিল। পরীক্ষার শেষে দুর্বল শরীরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে কল্যান। তখনই জানাজানি হয়ে যায় কথাটা।

দারিদ্রের সাথে মোকাবেলার এখানেই পরিসমাপ্তি। এর পরের ইতিহাস কেবলই সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার। তবে শুরুতেই একটা মজা হয়েছিল। চাকুরি মিলেছিল টিসিই, মানে টাটা কনসালটিং ইঞ্জিনীয়ার্স-এ। চেন্নাই বা বোম্বাই এর যেকোনো একটি শহরে পোস্টিং চাইতে পারত। ইতিমধ্যে উপবাসের অভ্যাসের সাথে সাথে অচেনা পথে চলার অভ্যাসটাও রপ্ত করে ফেলেছিল কল্যান। চেন্নাই তো নিজের শহর। জানা শহর। মুম্বাই অজানা জায়গা। সেটাই বাছাই করল সে। চলে গেল মুম্বাইতে। প্রথম চাকুরিতে জয়েন করতে। সঙ্গে সামান্য কিছু টাকা।

মজাটা হল এইবার। কল্যান রমনের নিজের কথাতেই জানা যাক সেটা। --বেশ মজার ব্যাপার হয়েছিল। যেহেতু পকেটে হোটেলে ওঠার পয়সা ছিল না, তাই স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্ম চত্বরে স্নান সেরে বাক্স-পেঁটরা নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম টিসিই-র অফিসে। ম্যানেজারের কাছে নিজের পরিচয় দিলাম। দেখি আমার পায়ের দিকে ওনার নজর। আমার

পায়ে ছিল চটি জুতো। আমায় কাছে ডাকলেন এবং চটি দেখিয়ে বললেন -'তুমি কোন কলেজ থেকে এসেছো জানি না, কিন্তু এখানে এসব চলবে না। কাল জুতো পড়ে তবেই এখানে আসবে'।

আমি জানালাম যে জুতো পড়ে আসতে পারব না। আমার কথা ওনার কাছে ঔদ্ধত্য বলে মনে হল। বিরক্তির সাথে বললেন -'এ কেমন ধরনের কথা?' আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম যে জুতো আমি পড়তে চাই না, এমন নয়। এই মুহূর্তে জুতো কেনার টাকা আমার কাছে নেই। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে জুতো কিনে নেব। এরপর আমি অনুনয়ের সাথে বললাম যে জুতোর কারণে আমার চাকুরিটা যেন খোয়া না যায়। কারণ চাকুরিটা আমার দরকার। আমার পরিবারের জন্যই দরকার।

আমার এই কথা শুনে ম্যানেজার ভদ্রলোক মনে হল একটু নরম হলেন। এখানে কোথায় উঠেছি জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম -'দাদার স্টেশনে'। একথা শুনে বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। দৌড়ঝাপ করে আগাম একমাসের মাইনের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর পর যে ক'দিন না একটি থাকার জায়গা জোগার করতে পারি সে ক'দিনের জন্য এক বন্ধুর ডেরায় থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এক জোড়া জুতোও কিনে দিলেন। সেটাই আমার জীবনে প্রথম জুতো।

কাহিনীর প্রথম পর্বের এখানেই ইতি। এর পর কল্যান রমন শ্রীনিবাসন এক চাকুরি ছেড়ে অন্য চাকুরি ধরেছেন। দেশ থেকে বিদেশে গেছেন। প্রথমে বিলেতে। তারপর ইউএসএ-তে। কম্পিউটার প্রোগ্রামার থেকে সিস্টেম ম্যানেজার হয়েছেন। এক কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েছেন। সেই থেকে সি ই ও। এখন নিজেই একটি কোম্পানির মালিক। দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে আছে তার ব্যবসা। কল্যান রমন শ্রীনিবাসনের নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে এখন শুধুই কল রমন। এই নামেই সবাই তাকে চেনে। গ্লোবালস্কলার ইন্ডিয়ার কর্ণধার শ্রী কল রমন। মুম্বাইতে পদার্পণ করেছিলেন উনিশ'শ নব্বই সালে। এখন দু'হাজার দশ। মাত্র কুড়ি বছরে এই পথ-পরিক্রমা।

কল রমনের আয়ের অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বরং অন্য প্রসঙ্গে আসি। কল্যান ফিরে এসেছেন ওর ফেলে যাওয়া গ্রামে। গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিক্ষাকেই নিজের জীবনে ধ্রুবতারা করে এগিয়েছিলেন কল্যান। এবার অন্যের জীবনে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিলেন নিজের গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো জন্য আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। অর্থের অভাবে পড়াশুনো করতে পারছে না এমন যে কারো জন্য ওর বাড়ির দরজা সর্বদাই খোলা। গ্রামের বেকার যুবকদের কথাও ভেবেছেন। লাগিয়ে দিয়েছেন নানান ধরনের কাজে।

কল্যান যখন তাঁর গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল গড়ার কাজে ব্যস্ত সেই সময়ে যোগাযোগ হয় মার্কিন যুক্তরাজ্যের এক বিনিয়োগকারীর সাথে। ইনি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বিনিয়োগে উৎসাহী। কল্যানকে তাঁর উদ্যোগে সামিল হতে আহ্বান জানায়। কল্যান সেই আহ্বানে সাড়া দেয়। এদের লক্ষ্য স্কুল-কলেজ স্তরের শিক্ষা সহায়ক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তাকে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা। কাজে যোগ দিয়েই কল্যান বিভিন্ন দেশে শিক্ষার পদ্ধতিগত দিকগুলি খতিয়ে দেখতে ঘুরতে শুরু করেন। চিন, ভারত, মার্কিন দেশ সহ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ ঘুরেছেন। তাঁর মনে হয়েছে যে ভাল শিক্ষকের অভাব সর্বত্রই। এমন কি খোদ মার্কিন দেশেও তার বড়ই অভাব।

ভাল লেগেছে কল রমনের এই পর্যবেক্ষণ। যদিও শিক্ষা-ব্যবসায়ে ন্যায্যতা দেবার কারণেই এই সিদ্ধান্ত কিনা জানি না; তা হলেও কথাটি যে সত্য, মানতেই হবে। ভাল শিক্ষকের অভাবের কথা আমরা সকলেই জানি। জানি নিজেদের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই। পরবর্তীকালে নিজে শিক্ষাকর্মে যুক্ত থেকে নিজের সীমাবদ্ধতার দিকটি দেখেছি। তাইতে বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝেছি।

শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আজকের সমাজে। তার প্রমাণ ব্যবসায়ীরাও এগিয়ে এসেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে। তাঁদের উদ্যোগে স্কুল কলেজ গড়ে উঠছে। কে কত উন্নতমানের শিক্ষা দিতে পারে তাই নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। ফলে উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতির চাহিদা তৈরি হয়েছে। তার জন্য অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত তাঁরা। সেই চাহিদা মেটাতে তৈরি হচ্ছে গ্লোবালস্কলারের মত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। কি ভাবে শিক্ষার বিষয়বস্তু আরো ভালভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাই নিয়ে চলছে গবেষণা। তৈরি হচ্ছে শিক্ষক ও ছাত্রদের ব্যবহারের উপযোগী নানান ধরণের সফটওয়্যার।

না, ভাল শিক্ষকের অভাব দূর করার জন্য কম্পিউটার

নির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতিই একমাত্র পথ সেকথা অবশ্যই বলব না। তবে যে দেশে স্কুলের ঘরই নেই বা ঘর থাকলেও ঘরের চালা থাকে না, সেখানে কম্পিউটার নির্ভর শিক্ষা হাস্যকর বলে যারা এমন উদ্যোগের উপযোগিতা উড়িয়ে দেন, আমি তাদের দলে নই। সুযোগ থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতেই পারে এতে ক্ষতির কিছু নেই। মনে রাখতে হবে দেশে যেমন চালা-হীন ঘরের স্কুল আছে, তেমনি ঘর-টেবিল-চেয়ার-ইলেকট্রিসিটি এবং কম্পিউটার সহ স্কুলও আছে। সেখানে গ্রামের ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনো করে। তাদের কথা ভেবেও শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে ভাবা দরকার। যদি কম্পিউটার ব্যবহার করে সে কাজ একটু ভালভাবে করা যায় তাতে ক্ষতির কিছু নেই। একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে কত রকম অ্যাপলিকেশন সফ্‌টওয়্যার তৈরি হয়েছে যা শিক্ষার বিষয়বস্তুকে বুঝতে কত সাহায্য করে। কম্পিউটার এই ব্যাপারে ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এই সুযোগ আমরাও কাজে লাগাতে পারি। এজন্য মেধাবী যুবকদের নিয়ে উদ্যোগ গড়ে তোলা যায়। এমন উদ্যোগের সুবিধে হল এতে মেধা আর আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই লাগে না।

তথ্যসূত্র: শোভা ওয়ারিয়র, রিডিফ ডট কম, ১ সেপ্টেম্বর ২০১০

রিপোর্ট

কোলকাতার গৃহহীন মানসিক রোগী

সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী

[ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি লক্ষ্মী নারায়ণ একজন প্রথিতযশা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। এই পশ্চিমবাংলাই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। অভিজ্ঞতা তাঁকে উপলব্ধি দেয় যে এদেশে গৃহহীন মানসিক রোগীরা আইন এবং পুলিশের দ্বারা সবথেকে বেশী নিগৃহীত হয়। গৃহহীন, পরিচয়হীন এবং অনেকক্ষেত্রে নামহীন এইসব রোগীরা - অধিকার হিসেবে কোন দাবীও রাখতে পারে না। দেশের বিভিন্ন আইন অনুযায়ী এদের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থার সংস্থান থাকলেও (যেমন, সরকারী হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল, ভ্যাগরান্টস্ হোম (Vagrants' home) ইত্যাদি) থাকলেও, সেসবের দরজা এদের জন্য বন্ধই থাকে। ডাঃ নারায়নন তাই একটি অভিনব পরিকল্পনায় কিছু বন্ধু শুভানাধ্যায়ীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ঈশ্বর সংকল্প'। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মাত্র ৫৫ বছর বয়সে (২০০৪ সালে) তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু 'ঈশ্বর সংকল্প' বেঁচে আছে। ডাঃ নারায়নের প্রদর্শিত পথে (কমিউনিটির সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা এদের জন্য উন্মুক্ত করা) এই কঠিন কাজ করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। শহরের রাজ্যের অন্য সব সহৃদয় নাগরিকদের সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে চান ঈশ্বর সংকল্পের কর্মীরা।]

আমরা প্রায় সবাই শহরের রাস্তায় মানসিক রোগীকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কখনও দেখি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কখনও দেখি নোংরা জামা কাপড় পরে আছে ও গা-হাত-পায়ে ময়লা-দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। কখনও কখনও মাথায়, শরীরে ম্যাগট (পোকা) এবং সঙ্গে খারাপ গন্ধ। কখনও নগ্ন অবস্থায় কখনও বা ভ্যাট থেকে নোংরা খেতে দেখি। এদের অনেকেই অসহায় করুণ অবস্থায় কষ্ট পেতে পেতে রাস্তাতে মরে পড়ে থাকে করপোরেশনের লোকজন তুলে নিয়ে যান।

একজন মানুষ হয়ে আর একজন মানুষের এই করুণ পরিণতি দেখে পথ চলতি কিছু মানুষের খারাপ লাগা থাকে। তৎক্ষণাৎ কিছু করার প্রবল ইচ্ছা ও সামর্থ থাকলেও অনেকেই আমরা কিছু করে উঠতে পারি না। এই খারাপ লাগা গুলিকেই ভিত্তি করে গৃহহীন মানসিক রোগীদের জন্য কিছু কাজ শুরু হয়েছে এই কোলকাতা শহরে।

পাখী

কয়েকটা ঘটনা বললে সহজ হবে। রাণীগঞ্জের লক্কার বাঁধ কোলিয়ারী এলাকার মেয়ে পাখী নামটি কাল্পনিক তের বছর বয়সে বিয়ে, ষোল বছর বয়সে বাচ্চা, উনিশ বছর বয়সে পাখী জানতে পারে তার স্বামী আরও একটা বিয়ে করেছে। পারিবারিক অশান্তি, একুশ বছর বয়সে মানসিক রোগ দেখা দেয় পাখীর। এই সময় পাখী কোন কাজ করে না, নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে, ঘরের মধ্যেই পায়খানা পেচ্ছাপ করে নোংরা করে রাখে। স্নান খাওয়া ঠিকমত করে না। ছোট বেলার ইতিহাস জানা যায় - সে ছিল খুব চুপচাপ, পাড়া প্রতিবেশি কারো সঙ্গে মেশে না, কোন বন্ধু বান্ধব নেই।

তার বাবা কোলিয়ারী শ্রমিক ছিলেন, বর্তমানে মারা গেছেন। দুই ভাইয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে আলাদা থাকেন। সংসারে অভাব অশান্তি আছে। বাবা একবার রাঁচিতে পাখীর চিকিৎসা করান কিন্তু পাখী একটু ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়। পাখী একদিন ভোর বেলা, ছেলেকে বাড়িতে রেখে, কাউকে কোন কথা না জানিয়ে বেরিয়ে পরেন

পাখী এবার থাকতে শুরু করে কোলকাতায় নারকেলডাঙা রেল ব্রিজের তলায়। তার মানসিক সমস্যাগুলি তো আছেই, সঙ্গে রাস্তায় থাকার একটা স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তাহীনতা তার চেহারা ও কথা বার্তায় প্রকট ছিল। তার স্বাধীনতা বলতে বাড়িতে থাকার সময় যে অশান্তি, শাসন, ঘৃণা, অপমান ছিল - রাস্তাতে সেইগুলি ছিল না। অপরিচিত কোন পুরুষ মানুষ কথা বললে দ্বিতীয় কথাতেই পাখী তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। কথা বলতে বলতেই ভয়ে চমকে উঠত।

আব্দুল্লা

আব্দুল্লার প্রকৃত পরিচয় জানা যায় - তার আসল নাম মানস গাঙ্গুলী। তিন বোন ও দুই ভাইকে নিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে তার বাবা মা এদেশে আসেন। ভাই বোনেদের অবস্থা মোটের উপর ভাল। তার দাদা থাকেন বর্তমানে হওড়াতে। তার কাছ থেকে জানা যায় ছোট বেলা থেকে মানসবাবু বড় বড় কথা বলতেন। এলাকায় কোন ঝামেলা হ'লে, সেটা পারিবারিক হোক বা রাজনৈতিক, মানসবাবু তাতে জড়িয়ে যেতেন এবং বাইরের

ঝামেলা খুব সহজেই ঘরের মধ্যে চলে আসত। এলাকায় যাত্রাপালা অভিনয় থেকে চাঁদা তোলা ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ সবেতেই মানসবাবু জড়িত। মানসবাবুর উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট বা তার বেশি। গায়ের রং পরিষ্কার, সুঠাম চেহারা, বড় বড় চোখ। উন্নত নাক। সুন্দর গলার স্বর, অদ্ভুত সুন্দর ধারণা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান করতে বা কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে তার জুড়ি মেলা ভার। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ যারা তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাদের বাড়ি মানসবাবু নিয়মিত যেতেন। যে কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত মহিলার সঙ্গে স্বাধীন সম্পর্ক থেকে প্রেম ঘটে যেত খুব সহজেই। গোবরডাঙ্গার আত্মীয়র কাছ থেকে জানতে পারি সেখানকার স্থানীয় লোক তাকে ভীষণ মারধোর করে পা ভেঙে দেয় এবং দুপায়ের হিপজয়েন্টে গভীর ক্ষত হয়। খুব করুণ অবস্থায় তার দিন কাটতে শুরু করে। হাঁটুর নিচে পায়ের মাংশপেশীতে ম্যাগট হয়। মধুমাছির চাকের মত সাদা সাদা পোকা, সঙ্গে খুব খারাপ গন্ধ বের হতে থাকে। মিশনারী অফ চ্যারিটিজ তাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান এবং সুস্থ হলে আবার রাস্তাতে রেখে যান। মানসবাবু অর্থাৎ আব্দুল্লা বাজাবাজারের কশাই পট্টিতে একটা পবিত্তক সিমেন্টের বেঞ্চে বসে থাকেন। আব্দুল্লার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বা তার বেশি। এলাকাটি ভীষণ নোংরা। আব্দুল্লাও নোংরা। তার মাথায় মুখে বড় বড় অবিন্যস্ত নোংরা চুলদাড়ি। সারা শরীরে কালোকালো ছোপ ছোপ ময়লা, বড় বড় নখ। কথা বলেন ইসারায় বা খুব আস্তে।

শ্যামলী

কুড়ি বাইশ বছর বয়সে শ্যামলীর বেশ ডাগর শরীর হলে কি হবে, শ্যামলীর যে মনের অসুখ. শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা করেন। প্রতিদিন সমাজকর্মী তার হাতে ওষুধ তুলে দেয়। সে হাত পেতে ওষুধ খায়। শ্যামলী কথা বলতে পারে না কিছু আকার ইঙ্গিত করে, এক ধরণের শব্দ দিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। শ্যামলী আগের থেকে বেশ ভাল কিন্তু সব সময় ভীষণ নোংরা থাকে। গা থেকে বিকট নোংরা গন্ধ বার হয়।

অনেক চেষ্টায় তাকে স্নান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে অভ্যাস করানো হ'ল। প্রতিদিন সে স্নান করে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরে - কিন্তু নতুন সমস্যা তৈরী হ'ল। প্রতিদিন গিয়ে দেখি শ্যামলী প্রায় নগ্ন অবস্থাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এই অবস্থা দেখে তাকে কাপড় দেওয়া হয়। প্রতিদিন তার কাপড় কোথায় যায় জিজ্ঞাসা করাতে সে হেসে কুটোকুটি যায়। পথ চলতি ছেলেদের দেখিয়ে আকার ইঙ্গিত করে সে বলে - ছেলেরা তার পোষাক টেনে ছিঁড়ে দেয়। ওটা তার যৌনতার পরিণতি. তাকে নিরাপদ যৌনতার সম্বন্ধে বলা হয়। সে এই যৌনতাকে উপভোগ করে। সমাজকর্মীর কথাকে সে ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

শ্যামলী গর্ভবতী হয়। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে আয়রণ ট্যাবলেট ও ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়, ডাক্তারের পরামর্শমত তাকে হোমে বা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় ও তাকে অনেক বার বোঝান হয় কিন্তু শ্যামলী রাজী হয় নি। প্রচুর লোকের সামনে শিয়ালদা স্টেশনেই তার বাচ্চা হয় এবং তার সবে জন্মান বাচ্চাটা চুরি হয়ে যায়। শ্যামলীর শরীর ও মন শোকে দুঃখে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শ্যামলীকে ভর্তি করা হয় বেহালার বড়দির নার্সিং হোমে। তার শরীর ও মনের উন্নতি হলে পরে তার ইচ্ছামত আবার তাকে শিয়ালদা স্টেশনে রেখে আসা হয়।

আমিনা

মেটিয়াব্রুজের একটি পরিবারের যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ ও ত্রিশ বছরের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে আমিনার মানসিক রোগ স্কিজোফ্রেনিয়া। ছোট মেয়ে একমাত্র অনিয়মিত রোজগারে, সেলাইয়ের কাজ করেন। তার আবার T.B. রোগ হয়েছে - মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে কাশির সঙ্গে। তার হাত পা চোখ মুখ ফোলা। বাড়িতে বৃদ্ধ মা, ঠিকমত চলাফেরা করতে অসমর্থ। বয়সের ভার ও অপুষ্টি তাকে চেপে ধরেছে। ছোট মেয়ে রেহেনা T.B. রোগের চিকিৎসা করেন অনিয়মিত ভাবে। মানসিক রোগের চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করে পরিবারটিকে সাহায্য করা যায় নি।

অনেকগুলি সমস্যা পরিবারটির উপর কাজ করছে - তাই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভালটা তাঁরা নিতে পারেন না।

আমিনা ও তার মায়ের হাতে একটি করে বিস্কুটের প্যাকেট দিই। আমিনা প্যাকেট খুলে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলে। পরে তার মায়ের হাত থেকে প্যাকেটটা কেড়ে নিল ও তার মাকে ঠুকে ঠুকে মারতে লাগল, কাউকে রক্ষা করার সুযোগ না দিয়েই।

আমিনা এখন কোলকাতার রাস্তাতে থাকে। এখানে পরিবারের কোন সমস্যা তার মধ্যে প্রভাব ফেলছে না। এখানে তার মা, ভাই, বোণ, প্রতিবেশি, আত্মীয়ের শাসানি, ঘৃণা, অপমান নেই। তার বেঁচে থাকার জন্য যা সামান্য দরকার তা রাস্তা থেকেই সংগ্রহ করে।

আমি নিজেই চিন্তিত ছিলাম এবং খারাপ লাগছিল - এই রাস্তার উপর এই মহিলা থাকবেন। রাত নামলেই অন্ধকার হবে, প্রচণ্ড বৃষ্টি বা রোদের সময় কি হবে? বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু আমিনা মেটাতে পারবে তো? দেখা গেল আমিনার কিছু শারীরিক সমস্যা আছে, মানসিক সমস্যা আছে। সে এলাকার

একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে - কাজেই তার জন্য একটা Management Plan তৈরী করা সম্ভব। রাত্রে আলো জ্বলে, মানুষের আনাগোনা আছে এমন জায়গাতে ঘুমোয় - অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার তার চেষ্টা আছে। তিনটি খাবারের দোকানে সে দাঁড়ালেই তাকে খাবার দেয়। এমনও হয়েছে দোকানে বউনি হয়নি তবুও সে খাবার চেয়েছে, এবং খাবার পেয়েছে নিয়ম করে। দুটি পরিবার তাকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় জিনিস ও খাবার দিয়ে সাহায্য করে। এছাড়া এই এলাকার প্রায় সকলেই তাকে চেনেন। যারা তাকে সাহায্য করছেন, জেনেছি আমিনা তাদের কাছে বোঝা নয়, আমিনা তাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করে না বরং এরা সকলেই আমিনার ভাল চান। এই সমস্ত তথ্য আমিনা সম্পর্কে সংগ্রহ করা হয়।

সমাজ কর্মী আমিনার সঙ্গে একটা পরিচিত ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী করেন। একজন গৃহহীন মানসিক রোগীর সঙ্গে সম্পর্ক, পরিচিতি তৈরী করতে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক সময় লেগে যায় এবং এই বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী করাটা এই কাজের একটা অঙ্গ।

আমিনার ব্যক্তিগত কি সম্পদ আছে দেখা যাক - আমিনার বয়স অল্প। এই বয়সে তাকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার অনেক ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে শর্ত পূরণ করা দরকার, সে সুস্থ হলে তা পারবে এমন সম্ভাবনা আছে।

'খিদা লেগ্যাছে জি খেতে দাও ক্যানে' - তার এই কথা বলার ধরনে দোকানের বৃদ্ধ কর্মচারী তার মালিকের সংস্কারকে উপেক্ষা করেই (বউনি না করে) খাবার দেয়। তার এই কথা বলার ধরণ আমিনার নিজের একটা সম্পদ, খুব ছোট বেলায় আমিনা হয়ত তার অজান্তে মায়ের কাছ থেকে এই ধরণটা শিখেছে। সে জামা কাপড় সুন্দর ভাবে পরে, টাকা পয়সা সে চেনে, গুণতে পারে, কিছু টাকা জমিয়ে নিজের কাছে রেখেছে।

পাখী, আঙ্গুরা, শ্যামলী, আমিনার মত গৃহহীন মানসিক রোগীদের কোলকাতা শহরে পাওয়া যায়। তাদের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ১০৪০ জন (২০০৭ সালের জুলাই থেকে অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত পাওয়া সংখ্যা। এই হিসেবের বাইরে অনেক আছে বলে বিশ্বাস)। রাস্তাতে থাকা এত মানসিক রোগী কোন একটি প্রতিষ্ঠানে রেখে চিকিৎসা করাতে গেলে (ক) বিপুল পরিমাণ খরচ (খ) বিশাল পরিকাঠামো (গ) এবং সমস্ত দায়ভার একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ে। এই সমস্যা থেকে বেরোনোর উপায় – রাস্তায় যে Support system এর উপর সে বেঁচে আছে সেটাকে নির্বাচন করা অর্থাৎ পুরো Community support ও মানসিক রোগীটিকে মূল্যায়ণ (assessment) করা। এবং এই কাজে অনেকগুলি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন কে যুক্ত করা এবং প্রচলিত আইনের সুবিধা নিয়ে এই মানুষটিকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

অসুস্থ হলে মানুষ ডাক্তারের কাছে আসে। সেখানে একটি খরচ থাকে চেয়ার টেবিল ডাক্তার একদিকে রোগী উল্টোদিকে কোলকাতার গৃহহীন মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত, বরং বলা যেতে পারে খানিকটা ওঝা চিকিৎসার মত, কাউকে সাপ কামড়ালে যেমন ওঝাকে ডাকা হয় বা ওঝা নিজেই আসেন - গৃহহীন মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রেও সেই রকম। Communityর লোকজন আমাদের বলেন তাঁদের এই জায়গায় এই মানসিক রোগী আছে তার চিকিৎসা প্রয়োজন।

তখন পুরো টিম যেখানে মানসিক রোগীটি থাকেন সেখানে যায়। সাইকিয়াট্রিস্ট, জেনারেল ফিজিসিয়ান, সাইকোলজিস্ট, সাইক্রিয়াট্রিক সোস্যাল ওয়ার্কার, সোস্যাল ওয়ার্কার এবং প্রত্যেকেই কাজ করেন সমষ্টির লোককে সঙ্গে নিয়ে এবং সমষ্টির লোককে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিভাবে? গৃহহীন মানসিক রোগীর খোঁজ পেতে, এই শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে কোন তথ্য পেতে, চিকিৎসার পর Community-র মানুষ এঁদেরকে ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব নেন। চিকিৎসায় একটু সুস্থ হবার পর এই মানুষটিকে অল্প অল্প কাজে যুক্ত করেন তার Communityর মানুষই। আবার কাউকে পরিষ্কার করা, হাসপাতালে ভর্তি করার সময় Communityর মানুষ সঙ্গে থাকেন।

কোন Communityর মানুষ এই কাজ করতে রাজি হবেন? আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি একজন গৃহহীন মানসিক রোগীকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য যা দরকার তার সমস্ত ধরণের উপকরণ এই (সমষ্টি) Communiny মধ্যে আছে। এই Communiny মধ্যে সমস্ত ধরণের মানুষ আছেন তার মধ্যে কিছু মানুষ এগিয়ে আসেন এই শ্রেণীর মানুষকে সাহায্য করতে। এই কাজে মানুষগুলির এগিয়ে আসার কারণ হিসাবে দেখেছি ধর্মীয় ভাবনা বা উচ্চ মতাদর্শ কাজ করছে।

এই Communiny তে কাজ করতে গিয়ে সমষ্টির মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয়, Communinyকে ভাল ভাবে জানতে বুঝতে হয়। সমষ্টির সঙ্গে অনেক সময় অতিবাহিত

করতে হয়।

একজন গৃহহীন মানসিক রোগীকে কি ধরণের চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয় তা এই ব্যক্তিকে (তিনি বুঝুন বা বুঝুন) জানানো হয় এবং কমিউনিটির লোককে জানানো হয়। সমস্ত জানার পরও যদি এই মানসিক রোগীটি যদি ওষুধ খেতে রাজি না হন তবে তাকে ওষুধ খাওয়ানো হয় না। সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে শুধু কথা বলা হয় ও প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হয়। কারণ মনে করা হয় একজন মানুষ সে যত খারাপ অবস্থাতেই থাকুক না কেন (শারীরিক, মানসিক, সামাজিক দিক থেকে), তিনি তার জন্য ভালটা বোঝেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারেন। তারই ইচ্ছাটাকে মর্যাদা দেওয়ার একটা চেষ্টা থাকে।

আবার ফেরা যাক ওদের কথায়। অনেকদিন রাস্তায় থাকার কারণে পাখী খাবার থাকার নিয়ম, দায়িত্ব, কর্তব্য এসবগুলি সহজেই উপেক্ষা করে। তাই তাকে প্রথমে হোমে রাখা হয়। হোমে থাকার সময় পাখীকে তার ভাই, ছেলে ও গ্রামের দুই জন লোক দেখতে আসে।

তার ফেলে আসা ছোট্ট ছেলেটি বেশ বড় হ'য়ে যাওয়ায় পাখী বিস্ময়ে চুপ হ'য়ে থাকে অনেকক্ষণ, তার পর বলে- এর গোঁফ হয়েছে। আরও একটা বিষয়, হোমে থাকাকালীন পাখীর মধ্যে কোন কাজে আগ্রহ দেখা যেত না। ছেলেকে দেখার পর তার নিজের কাজে ও অন্যের কাজে বিশেষ যত্নবান হন। বর্তমানে পাখী তার নিজের বাড়িতে ভাল আছেন। প্রতিদিন ওষুধ খান, সংসারের কিছু কিছু কাজ করেন।

বর্তমানে শ্যামলী আগের মতই নোংরা অবস্থাতে থাকে। তাকে ওষুধ বা খাবার দেওয়া যায় না নিয়মিত। মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস কম। সম্ভবত তার বাচ্চাটা চুরি যাওয়ার কারণেই। কখনও কখনও তার পুরনো পুরুষ বন্ধুটির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখা যায়। মাটির হাঁড়িতে চাল, আলু, মুরগির ছাল বা পচা মাছ সেদ্ধ করে খেতে দেখা যায়। তবে সবই অগোছাল, বর্ণহীন প্রেম-ছাড়া।

নিয়মিত ওষুধও খাবার খেয়ে এবং কমিউনিটির **support**-এ আমিনা একটু একটু করে সুস্থ হ'তে থাকেন। আস্তে আস্তে তার শরীর, মন, কথাবার্তার মধ্যে স্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সুস্থ হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিক রোগীদের মধ্যে সেই কমিউনিটির প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, ছেলেদের ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত হ'য়ে পড়া হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া বা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মত ঘটনা যেমন প্রায়শই ঘটে, তেমনিই সুস্থ হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিটির মধ্যে তার পুনর্বাসন শুরু হ'তে দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে

মানস গাঙ্গুলী থেকে হ'য়ে ওঠা আব্দুল্লার মধ্যে সেটা দেখা গেছে। কমিউনিটির মধ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকদিন নিয়ম করে ওষুধ না দেওয়া বা বয়সের কারণে অসুখের তীব্রতায় সুস্থ হতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রেই এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠা গেছে যেখানে, সেখানে তার পুর্নবাসনের সময় দেখা গেছে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, ধর্ম, মূল্যবোধ, মানসিকতা, পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং কমিউনিটি থেকে পাওয়া সুযোগ, সুবিধাগুলির মেলবন্ধন ঘটাতে পারলে তার পুনর্বাসন হয় খুব সহজেই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা **Community**র লোক আমাদের নিয়ে গেলেন আব্দুল্লার কাছে সেখানে ডাঃ রঞ্জিতা বিশ্বাস তার চিকিৎসা করেন। স্থানীয় এক যুবক তার হাতে প্রতিদিন ওষুধ তুলে দেয়। সমাজকর্মী প্রতিদিন তার সঙ্গে কথা বলেন। আব্দুল্লা যে **Support System**এর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন সমাজকর্মী সেটাকে **Identify** করেন ও **Community** এই **Support System**কে পুনরায় জীবিত করেন এবং আব্দুল্লা তার নিজের ক্ষমতার মধ্যে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে আব্দুল্লা প্রতিদিন নিজের দায়িত্বে ওষুধ খান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, নামাজ পরেন, মসজিদে যান বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেশেন। মসজিদ থেকে পাওয়া পয়সা জমিয়ে আব্দুল্লা একটা মোবাইল ফোন কিনেছেন। মুসকিল হল তার নিজের নামে সিম কার্ড পাওয়া নিয়ে। সমাজকর্মী বিষয়টি লক্ষ্য করতে থাকেন কিন্তু তাকে নিজের নামে সিম কার্ড পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে যত্নবান হননি। দেখা গেল স্থানীয় এক ভদ্রলোক আব্দুল্লাকে তার ছেলের পরিচয় দিয়ে সিমকার্ড এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লার কিছু মানসিক সমস্যা এখনও আছে, তিনি নিয়ম করে ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য একা হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরি ও ওষুধের দোকান যান অন্য মানসিক রোগীকে মাঝে মাঝে পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। দুঃস্থ মানুষদের জন্য জামা কাপড় সংগ্রহ করেন।

এক সহকর্মী আব্দুল্লাকে জিজ্ঞাসা করেন – মানসবাবু এটা কিসের মাংস খাচ্ছেন? মানসবাবু মুহূর্ত কাল চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে বলেন - হরিণের মাংস, দেখুন ভাল করে।

Community তে কাজ করতে গিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা

নাম সঞ্জয় গান্ধী, গায়ের রং কালো, রোগা, উচ্চতা প্রায়

৫ফুট আট ইঞ্চি, মাথায় সাদা সাদা ম্যাগট (পোকা) তাতে নোংরা কাপড় বাঁধা, পোকা, পুঁজ, রক্ত মাথা বেয়ে পড়ছে, গোটা গায়ে চুলকানী – ফুটপাতের উপর শুয়ে গা ঘসছে। তাও মাথা গা থেকে এতটাই গন্ধ ছড়াচ্ছে যে কেউ তাকে কাছে আসতে দেয়না।

কাঁকুড়গাছিতে মেডিকেল ক্যাম্প হচ্ছে - উদ্দেশ্য - (১) সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস জন্মানো যে এই মানুষটির সঙ্গে এই ভাবে আচরণ করা সম্ভব (২) এই মানুষটিকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসা সম্ভব এবং কাজটি করতে হবে স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাঁচজন সমাজকর্মী অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তার কাছে গেলাম সঞ্জয় গান্ধীকে প্রথমে খাবার দিয়ে বললাম আমাদের সঙ্গে ডাক্তার আছে, তাঁরা ওষুধ দিয়ে তোমার মাথা পরিষ্কার করে দেবেন। এতে কি তোমার সুবিধা হবে? সঞ্জয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছি তখন প্রায় দুইশত লোক আমাদের ঘিরে ধরল, তারা কেউ বলল 'এরা সরকারী কর্মী'। কেউ বলল 'একে তুলে নিয়ে চলে যান'। কেউবলল 'এটা খুব ভাল কাজ' আবার কেউ বলল - এটা খোদার কাজ হচ্ছে। সমাজ কর্মীরা ঘিরে ধরা লোকের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। সঞ্জয় মেডিকেল কলেজে যেতে রাজি হয় এবং গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এমন সময় অনেকগুলি অপরিচিত লোক একসঙ্গে সঞ্জয়কে বলতে থাকেন – 'যা না' 'চল যা'। এই সমস্ত লোক তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়, ভাল করে কথা বলত না, হঠাৎ করে এই লোকগুলি তার ভাল চাইতে থাকায় সঞ্জয় ভয় পেয়ে যান এবং যাওয়া থেকে বিরত হন। তাকে মেডিকেল ক্যাম্পে আনা সম্ভব হয়নি।

তাই বলে সঞ্জয়কে এই রকম অসহায় ভাবে রেখে দেওয়া যায় না। ঠিক হয় R.G.Kar মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করানো হবে এবং স্থানীয় লোককে এই চিকিৎসার কাজে যুক্ত করা হবে।

সেইমত একদিন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে সঞ্জয়ের কাছে আসা হয়। সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা শুরু হয়। আবারও অনেক লোক ঘিরে ধরে এবং এক একটা মন্তব্য করতে থাকেন। আমরা স্থানীয় লোককে বলি, সঞ্জয়ের চিকিৎসার জন্য আপনাদের সক্রিয় সহায়তা দরকার - ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কমিউনিটি থেকে দুইজন লোককে সঙ্গে নিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় R.G. Kar হাসপাতালে।

বেনিয়াপুকুর এলাকায় একটি পনের ষোল বছরের ছেলে প্রতিদিন ব্রাউন সুগার খায় এবং চুরি করে ব্রাউন সুগার কেনার পয়সা জোগাড় করে। সমাজকর্মী ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে কিছু জানতে পারেনি। তাই কয়েকজন গৃহহীন মানসিক রোগীকে ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় তার উপর। একবার ছেলেটি চুরি করতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পরে এবং তখন বলে এই মানসিক রোগীদের ওষুধ দেওয়ার জন্য সে রাত্রে এখানে ঘুরছে। এই ভাবে মিথ্যা বলে সে পুলিসের হাত থেকে রক্ষা পায়। চোর বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এমন একজনকে এই কাজে যুক্ত করায় স্থানীয় বেশ কিছু লোক সমাজকর্মীর সঙ্গে বচসা শুরু করে। সেবামূলক কাজের অজুহাতে এই রকম একজন অসামাজিক ছেলে পুলিসের হাতে থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়ায় তাদের ক্ষোভ।

গোপাল

গড়পারের গোপাল। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়স। বড় বড় চোখ, সুঠাম চেহারা কিন্তু খুব শান্ত। কথা বলে না দীর্ঘ দিন। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে ভোগার কারণে। ভীষণ রকম নোংরা। দোকানের সামনে দাঁড়ালেই খাবার পেয়ে যায়। ফুটপাতে ঘুমায়। একদিন দেখলাম এক হাতে গরম খাবার ও দশটাকা, অন্য হাত দিয়ে ভ্যাট থেকে নোংরা বেছে বেছে মুখে দিচ্ছে। ২০৪/১ বাসের ড্রাইভার কমলদা মাঝে মাঝে গোপালের চুলদাড়ি নখ কেটে দেন। ভাল জামাকাপড় পরান, খেতে দেন। আরও একদিন খাবার হাতে করে যাবার পথে গোপালের নোংরা শরীর এক ভদ্রলোকের গায়ে লাগে। ভদ্রলোক খুব রেগে যান এবং পা দিয়ে গোপাল কে মারেন, খাবার ফেলে দেন। গোপাল মাটিতে পড়ে যায়। গোপাল শান্ত ভাবে মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায়. তার মধ্যে কোন রকম ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ অভিমান দেখা যায় নি এবং সে সেখান থেকে চলে যায়।

মুহূর্তের মধ্যে চার-পাঁচ জন লোক সেই ভদ্রলোককে ঘিরে ধরেন ও বকাবকি শুরু করেন। বকা খেয়ে ভদ্রলোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ভুল স্বীকার করেন এরা কেউই কিন্তু গোপালের আত্মীয় পরিজন নন। কেবল পরিচিত মাত্র। এদের সবার নজরে গোপাল আপন খেয়ালে থাকে।

নামাজ

কুড়ি বছর বয়সের এক মানসিক রোগীকে দেখা গেল রাজাবাজার এলাকায়। তার হাত পায়ের পাতা, জননাঙ্গ আগুনে পুড়ে গেছে। স্থানীয় এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাকে পেনিসিলিন ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছিলেন। ডাক্তারের পরামর্শমত তাকে সিলভার এক্স মলম ও ট্যাবলেট দেওয়া হল। পায়ের পাতার ক্ষততে ম্যাগট দেখা দেয়। হাজার ম্যাগট নিয়ে সে কমিউনিটির মধ্যে ঘুরতে থাকে। সব জায়গায় সাদা সাদা পোকা খসে খসে পড়তে থাকে. এই সব দেখে স্থানীয় লোকের মধ্যে ভয়, ঘৃণা তৈরী হয়। সমাজ কর্মীর উপর ক্ষোভ, রাগ-উগরে দিতে থাকেন – কারণ তারা মনে করেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এই ধরনের রুগীকে সমাজকর্মীরা ধরে এনে এখানে ছেড়ে দেন। স্থানীয় লোকের ক্ষোভের প্রকাশ

এভাবেই ছিল সমাজকর্মী ভয় পেয়ে যান।

বহুক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কিছু মানসিক রোগী ওষুধ খেয়ে সুস্থ হওয়ার পর তাদের প্রশিক্ষিত করে ড্রপ-ইন-সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের সামাজিক, ব্যবহারিক দিক থেকে উন্নত করে তোলার জন্য, হাতের কাজ শেখানোর জন্য। প্রতিদিন তাদের এই ভাবে নিয়ে যাওয়া ও আসা হয়। এটা দেখে স্থানীয় মানুষ মনে করেন সমাজকর্মীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে মানসিক রোগীদের ধরে এনে এখানে ছেড়ে দেন। এতেই তাদের রাগ হয়। ঐ দিনই স্থানীয় মানুষকে ও নবনির্বাচিত পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে N.R.S. মেডিক্যাল কলেজের নবনির্মিত পাশ থেকে সমস্ত মালপত্র পরিষ্কার করা হয়।

অসুবিধা

প্রতিভাবান কর্মী, বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা গৃহহীন মানসিক রোগীদের নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসছেন না। পৃথিবীর সমস্ত ছোট বড় শহরে এই সমস্যা আছে, কিন্তু কারও কাছে সমাধান সূত্র নেই। সমাজের মূল স্রোতে এই মানুষগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানের সহযোগী রূপে যুক্ত হওয়া দরকার। তাই কর্মঠ, বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েদের এই সমাজ সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসা দরকার।

পাভলভ, লুম্বিনী, এবং সাতটা সরকারী মেডিকেল কলেজে সাইক্রিয়াটিক বেড আছে। ঠাকুরপুকুর ও হাওড়াতে ভ্যাগরান্সি হোম আছে। এই সমস্ত জায়গা রাস্তার মানসিক রোগীদের জন্য ব্যবহার করতে পারলে সমস্যাটি সমাধান করা যেত খুব সহজেই।

একদল সাধারণ লোক মনে করেন - NGO-রা এই রকম একটা সংবেদনশীল সমস্যা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর পয়সা তছরূপ করছে, চুরি করছে। আর সমাজকর্মীর পরিবার আত্মীয় স্বজন মনে করে, এটা একটা নিচু মানের কাজ।

সমাজ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যারা নীতি নির্ধারণ করেন এবং সাধারণ মানুষ যারা গৃহহীন মানসিক রোগীদের নিয়ে ভাবেন, তাদের সকলের কাছে এই কাজের ধরণটা একটা সমাধান সূত্র বলে বিবেচিত হচ্ছে। তবে আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন আছে ...।

রিপোর্ট

আয়লা পরবর্তী সুন্দরবনের নোনা মাটিতে ধান চাষ নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ

শমীক সরকার

সুন্দরবনের নোনা মাটি কতটা নোনো তার মুখভর্তি প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম, যখন ২০০৯ সালের ২৫ মে আইলার পর। বিধ্বস্ত সুন্দরবনে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে যাওয়া হয়েছিল কয়েকজন মিলে। এমনিতেই ডাক্তারবাবুরা বলে দিয়েছিলেন, ওখানে গিয়ে কিছু খাবে না, জলও না কিন্তু সঙ্গের নিয়ে যাওয়া জল যখন শেষ হয়ে গেল, তখন আমরা আর কী করব, অগত্যা ওখান থেকেই চেয়ে খেলাম জল।

নুন লেগে নষ্ট হয়ে যাওয়া ধানগাছও দেখেছিলাম, আয়লার কয়েকমাস পর যখন আবার গেছিলাম বেশ কয়েকটি দ্বীপে, কেমন আছে সুন্দরবনের মানুষ তা জানতে। আধহাত লম্বা ধানগুচ্ছগুলো হলুদ হয়ে যাচ্ছে গোড়ার দিক থেকে। নোনা মাটিতে এবার ধান হবে না, তা জানার পরও কিছু কিছু জমিতে, জমি দু-তিনবার ছেঁচে নুনটা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তারপর ধান লাগিয়েছিল কিছু কিছু দ্বীপের বাসিন্দারা। বীজতলা করে এনেছিল অন্য জায়গা থেকে। আমরা দেখেছি, নৌকা করে বীজতলা নিয়ে আসছিল চাষিরা। কিন্তু সেই ধানও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ফুলিয়ার কৃষিগবেষকরা আমাদের বলেছিলেন সাত আটটি ধানের কথা। ক্যানিং সেভেন, মাতলা, নোনাবোখরা, হ্যামিল্টন — এইরকম। এগুলো সব নোনা মাটিতে ফলে। কিন্তু সুন্দরবনের বেশিরভাগ চাষিই এইসব ধান চাষ বন্ধ করে দিয়েছে, বদলে ব্যবহার করে সংকর প্রজাতির ধানবীজ, যেগুলোতে 'ইল্ড' বা ফলন অনেক বেশি। তাই সুন্দরবনে আমরা অন্তত এই ধান চাষের কোনও জায়গা খুঁজে পাইনি। সরকার থেকে দিয়েছিল নাকি পঙ্কজ — সংকর ধান। নোনা মাটিতে তা হয়নি।

কুমীরমারি দ্বীপের এক চাষি আমাদের বলেছিলেন, আপনারা ত্রাণ করছেন, নোনা জমিতে ফলে এমন ধান নিয়ে আসুন, আমরা কিনে নিয়ে চাষ করব। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করে বুঝবেন, হবে? বলেছিল, আমরা বীজতলা দেখেই বুঝে যাব। তারপর আমরা খুঁজেছিলাম, এরকম কোনও বীজ কোনও সরকারি সংগ্রহশালায় আছে কিনা, নেই। কৃষি বিজ্ঞানী দেবল দেব মহাশয়কে জিজ্ঞেস করে আমাদের এক বন্ধু জানতে পেরেছিলেন, এই সব ধান সরকারের কাছে সংরক্ষিত নেই। ব্যক্তিগত কারোর কাছে থাকতে পারে। তাঁর কাছে কিছু ছিল, তা তিনি দিয়ে দিয়েছেন দিন কয়েক আগে অতএব আমরা পারিনি নোনা ধানের বীজ ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে নিয়ে যেতে।

আইলা ঝড় পরবর্তী সুন্দরবনের মাটিতে এবং পুকুর বা মাঠে জমে থাকা জলে নুনের পরিমাণ কত, তা নিম্ন একটি ল্যাবরেটরি-সমীক্ষা করা হয়েছিল। তিনমাস পরেও যে মাটি যথেষ্ট নুনে ভরে আছে, তা বোঝা গিয়েছিল তখন। সুন্দরবনে লোকে বলেছিল, বর্ষার ধান লাগানোর পর, যদি রোদ দেয়, তাহলে ধান মরে যাবে। যদি বৃষ্টি হয়, ধান থাকবে। রোদ দিলে ধান মরে যাবে, কারণ মাটিতে নুনের ঘনত্ব বেড়ে যাবে।

আয়লার একবছর পরের আমন ধানটা বেশ ভালো হয়েছে সুন্দরবনে, জানা গেল সম্প্রতি। আমাদের এই দেশ কোনও কিছুকেই তো বাদ দেয় না, তাই আমাদের এত বৈচিত্র্য, তাই নোনা ধানের বীজগুলোও পুরো ধ্বংস হয়ে যায় নি — বোঝা গেল এবার। সরকার না হয় বীজ সংরক্ষণ করে নি, কিন্তু এলাকার কেউ কেউ করেছে। সেই জন্যই বেশ কয়েকটি নোনা ধানের, দেশি ধানের চাষ হয়েছে সেখানে। যেমন হয়েছে সংকর ধানের চাষ। খোলা বাজারে কিনতে পাওয়া গেছে দেশি ধান-বীজ। দেশি নোনা ধানের মধ্যে চাষ হয়েছে নোনাবোখরা, কালোমোটা, আঁশফল — এইসব ধান এক প্রজন্ম আগেও বেশ চাষ হত সুন্দরবনে। তখন গোটা সুন্দরবন মাছের ভেড়িতে ছেয়ে যায়নি। এবার আয়লার ফলে পলিও জমেছিল সুন্দরবনের জমিতে। পরপর দুটো বর্ষায় নুন ধুয়ে গিয়ে সেই পলি জমিয়ে দিয়েছে এইবছরের ধানচাষ। পঙ্কজ, জয়ার মতো সংকর ধানও এবারে ভালো হয়েছে সেখানে

কিন্তু গীতাঞ্জলী পাটনাই নামের দেশি ধানটা এবারে নষ্ট হয়েছে মাজরা পোকা লেগে। বাজার থেকে কেনা হয়েছে এই বীজ, এবং সম্ভবত এটা ভালোভাবে সংরক্ষিত ছিল না, তাই এই দুর্গতি — এমনই মত এক চাষির। যদিও সেখানকার অনেক চাষিই দুষছে কৃষিবিজ্ঞানীদের জ্ঞান-কে, যারা সুন্দরবনে দেশি, নোনা ধানের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন

একজন গাঁয়ে মানে না মাস্টারের বকবকানি

রবীন চক্রবর্তী

ছাত্রাবস্থায় নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় হরেক বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টি অবধারিতভাবে থাকত তা হল, শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনা। কে কেমন তাই নিয়ে আলোচনা। অমুক স্যার দারুণ, তমুক বাবু বোর, এমন তর্ক প্রায়শঃই হত। কেন একজন ভাল, অন্য জন নয়, তাই নিয়ে তর্ক হত। কর্মজীবনে প্রবেশ করার অনেক পরেও ছেলেবেলার ওই স্মৃতি মুছে যায়নি। স্কুল বা কলেজের বন্ধুরা একত্র হলে এখনও প্রিয় বিনোদবাবু বা টিকোব স্যারদের কথা আলোচনায় উঠে পড়ে। লক্ষণীয় যে এই ভাল-স্যারদের সংখ্যা খুব বেশি হয় না। কেন হয়না, ভাববার বিষয়।

কিছু মাস্টারমশায় যেমন পছন্দের ছিলেন তেমনি কেউ কেউ ছিলেন মূর্তিমান আতঙ্ক। আবার এমন সরল গোবেচারা ধরনের কেউ কেউ ছিলেন যে ছেলেরা অবলীলায় তাঁর পেছনে লেগে পার পেয়ে যেত। কলেজে পড়ার সময়, ক্লাসঘরে কিছু কিছু শিক্ষকের যে ধরনের হেনস্থা হওয়া দেখেছি, তারপর ভবিষ্যৎ জীবনে মাস্টারি করব এমন ইচ্ছে উবে গিয়েছিল। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। অবশেষে এমন কাজে ঢুকতে হয়েছিল যেখানে পড়ানটা অন্যতম কাজ ছিল।

পড়াশোনার পাট চুকিয়ে কিছুদিন চেষ্টা করে কোনো কাজ না জোটায় সায়েন্স কলেজে এক মাস্টার মশায়ের কাছে গবেষণার কাজে ঢুকেছিলাম। মতলব ছিল কিছু একটা জুটলেই সটকে পড়ব। স্যারকে সেটা বলে রেখেছিলাম। চাকরি একটা খুবই দরকার, বলেছিলাম। তখন কলেজ মাস্টারির চাকুরির জন্য এখনকার মত নেট-স্লেট ইত্যাদির হুজ্জতি ছিল না। চেনাজানা থাকলে মফঃস্বলের কলেজে কাজ জুটে যেত। আমার চাকরির কথাটা স্যার মাথায় রেখেছিলেন। কিন্তু সেটা যে কলেজে চাকুরি, জানতাম না। স্যারের ঘরে একদিন ডাক পড়ল। গেলাম। যেতেই ঘরে বসা একজনকে দেখিয়ে বললেন ইনি পাশকুড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। একজন ফিজিক্সের টিচার চাইছেন। যাবে নাকি? আমার মাথায় বাজ।

মনে পড়ে গেল কলেজের সেই অঙ্কের মাস্টারমশায়ের কথা। যিনি ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সমবেত কণ্ঠে বিকট উ-উ-উ-আওয়াজ উঠত। এবং সেটা চলতেই থাকতো। স্পষ্ট শুনতে পেলাম সেই আওয়াজ আমার কানের মধ্যে তখনই বাজতে শুরু করেছে। আতঙ্কিত হয়ে বললাম -না স্যার, যাব না। সাত-পাঁচ বানিয়ে কারণ একটা বললাম। এর পরেও বার কয়েক এমন ঘটনা ঘটেছে। আসল কারণটা স্যারকে বলিনি তাই। হঠাৎ-ই একদিন ডেকে বললেন ডিপার্টমেণ্টে দুটো ক্লাস নিতে হবে। সর্বনাশ, এবার যাই কোথায়? দেবো না বললে যা গুটি কয়েক টাকা ফেলোশিপ হিসেবে পাই, সেটাই যদি ফসকে যায়? ফলে রাজি হয়ে যেতে হলো। সেই শুরু । তারপর একসময় মানিয়ে নিই। তবে শেষ বেলায় অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে ধরে ধরে ছেলেমেয়েদের বলতাম মাস্টারির মত চাকুরি আর হয়না। উদ্দেশ্য তাদেরকে এই লাইনে টেনে আনা।

সেই অঙ্কের মাস্টারমশায় মানুষটি কিন্তু ভালই ছিলেন। তবু তাঁর ক্লাসে কেন যে এমন হট্টগোল হত বুঝতাম না। একটু সাবেক ধরনের মানুষ ছিলেন। ধুতি পাঞ্জাবি পড়তেন। সাদা কেমব্রিক কাপড়ের পাঞ্জাবী। তখন বেশির ভাগ মাস্টার মশায়েরই এই পোষাক ছিল। গলা অবধি পাঞ্জাবির বোতাম আটকাতেন। গলার দিকটা অনেক সময়ই ঘামে ভিজে লাল্‌চে হয়ে থাকত। ক্লাসের হট্টগোলের মধ্যে সায়লেন্স সায়লেন্স বলে টেবিলে ডাস্টার ঠুকতেন। একসময় হাল ছেড়ে দিতেন। হই-হল্লার মধ্যেই পড়ান শুরু করতেন। এটা ওটা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। বোর্ডে প্রবলেম লিখে দিতেন। ভাবতেন হয়তো কেউ চেষ্টা করে দেখবে। কে শোনে সে কথা? এক সময় নিজেই কষে দিতেন অঙ্কটা। এইভাবে চলত ডিনামিক্‌সের ক্লাস।

পরে বুঝেছি ক্লাস ম্যানেজ করার জন্য খানিকটা ট্যাকটেরও প্রয়োজন আছে। ট্যাক্‌ট মানে ছেলেমেয়েদের মনোভাব বুঝে দরকারে ওদের সাথে একটু তাল দেওয়া। কলেজেরই আরেকজন অঙ্কের মাস্টারমশায় তেমনটাই করতেন। ওনার ক্লাসেও শুরুতে হইচই হতো। কিন্তু পড়াতেন যখন সেটা থেমে যেত। উনি নামি লোক ছিলেন। ওনার লেখা বই আমরা পড়তাম। উনি ক্লাশে এসে কিছু মজার কথা বলে হইচই-কে আরো উস্কে দিতেন। তারপর একসময় সবাইকে থামতে বলতেন। ক্লাস চুপ হয়ে যেত। পড়ান চলতো। পড়ানর মাঝেও এটা ওটা বলে মজা করতেন। ওই স্যার আমাদের

বেশ প্রিয় ছিলেন। পরে বুঝেছি এই প্রিয় হয়ে ওঠা মানেই ভাল মাস্টার হওয়া নয়। তবে অবশ্যই এক কদম এগোনো। ছেলেমেয়েদের মনের কাছে এগোনো মানে বলতে চাওয়া কথাটা শোনানর সুযোগ তৈরি হওয়া। এর পর আসছে কি বলতে চাওয়া আর কিভাবে বলা। তার ওপরই নির্ভর করছে ছেলেমেয়েদের কাছে মাস্টার মশায়ের 'দারুণ স্যার' হয়ে ওঠা।

কলেজে পড়াকালীন অনার্সের একজন মাস্টার মশায়ের কথা মনে আছে। ওনার ক্লাস করতে ভাল লাগত। কেউই ওনার ক্লাস মিস করতে চাইত না। খুব গোছানো ছিল পড়ানর কায়দাটা। ক্লাসেই অনেকটা পড়া হয়ে যেত। নোটও তৈরি হয়ে যেত অনেকটাই। রাশভারি গোছের মানুষ ছিলেন তিনি। একটিও বাড়তি কথা বলতেন না ক্লাসে। পড়াতেন ফিজিক্যাল অপটিক্স। শুরুতেই আগের দিনের ক্লাসে পড়ানো বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন। এজন্য মিনিট খানেক সময় নিতেন। এর মধ্যেই প্রায় সব ক'টা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করে ফেলতেন। এর পর ওই দিন কি পড়াবেন সেটা জানাতেন। যতদূর মনে পড়ে বোর্ডের বাঁদিক ঘেঁষে টপিক-কটা লিখে দিতেন। এর পর শুরু হত পড়ানো। কথা বলতেন কেটে কেটে, স্পষ্ট করে। একদম তাড়াহুড়ো করতেন না। বোর্ডে লিখতেন ধীরে। এমনভাবে যে ছেলেরা তার সাথে তাল রাখতে পারে। লিখে নিতে পারে। হাতের লেখাটাও ছিল সুন্দর। সব মিলিয়ে একটা প্রশান্তভাব ছড়িয়ে থাকতো গোটা ক্লাসের সময় জুড়ে। শেষ পর্বে এসে ফের একবার সেদিনকার বলা বিষয়টি সাম আপ করে দিতেন। আমাদের কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাইতেন। ঘন্টা পড়ত। উনি আমাদের সবার মুখের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে চক-ডাস্টার-রোল-রেজিস্টার গুছোতেন, যেন বুঝে নিতে চাইতেন আমাদের প্রতিক্রিয়া। এবং তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন।

তখন বুঝিনি, কিন্তু পরে বুঝেছি যে ওনার প্রতিটি ক্লাসের পিছনে অনেকখানি ভাবনা লুকিয়ে থাকত। গোটা ক্লাসের ব্যাপারটা আগেভাগেই নিখুঁতভাবে ছকে রাখতেন। কতখানি পড়াবেন, কিভাবে পড়াবেন, কোথায় শেষ করবেন সব কিছু। এমন কি বোর্ডে লেখার সময়টুকু পর্যন্ত হিসেব কষা থাকতো হয়তো। আবার এমন এমন মাস্টারও আমরা প্রায় সকলেই দেখেছি যাঁদের সময়ের ব্যাপারে কোনো হিসেব থাকে না। কোন অংশ কতটুকু পড়াবেন, সংক্ষেপে না বিশদে, কিছুই ঠিক থাকে না। ফলে শেষ পর্বে এসে বেজায় তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দেন এবং যাহোক করে ক্লাস শেষ করেন। বুঝতেও পারেন না এর ফলে ওনার সেদিনকার গোটা পরিশ্রমটাই মাঠে মারা গেল। এমন শিক্ষকের সংখ্যা কিন্তু খুব কম না। অথচ ক্লাসের এই সময়টুকু কত মূল্যবান। একটি কোর্সের একটি বিষয় একদিন একবারই চর্চা করার সুযোগ হয় ক্লাসে। অথচ সেটা ভন্ডুল হওয়া মানে না-বোঝা রয়ে গেল সেই অংশটুকু। ওই দিনের বিশৃঙ্খলার কারণে হয়তো পরের অংশটুকুও না-বোঝা থেকে যাবে ছেলেমেয়েদের।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এম.আই.টি'র নাম আমরা প্রায় সকলেই জানি। সেখানে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরাও কাজ করেন, ছাত্রদের পড়ান। এহেন ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের পালনীয় কর্তব্য বিষয়ে একটি নির্দেশিকা পুস্তিকা আছে। তার একটি কপি একবার দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পুস্তিকাটির নাম 'ইউ অ্যান্ড ইওর স্টুডেন্টস্'। পুস্তিকাটি পড়ে আমার চক্ষু স্থির। বলে কি? মাস্টার মশায়রা ক্লাসে গিয়ে কি রকম আচরণ করবেন, কিভাবে পড়াবেন, প্রতিটি ক্লাসের জন্য কতটা সময় প্রস্তুতি নেবেন, কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন, কিভাবে বোর্ড-ওয়ার্ক করবেন, ক্লাশের অমনোযোগী ছাত্রটিকে কিভাবে ম্যানেজ করবেন, প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস কিভাবে চালাবেন, এমন কি ক্লাসের বাইরে করিডোরে দেখা হলে ছাত্রদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবেন সেই পরামর্শটুকুও দেওয়া আছে। ঠিক নির্দেশের ভঙ্গিতে নয়, ভাবখানা যেন এসব কথা তো সবারই জানা, তাও আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া। কিন্তু পুস্তিকাটি এমনভাবে তৈরি যে, হাতে পরলে না পড়ে থাকা যায় না। মজা এইখানেই। পুস্তিকাটি মাস্টার মশায়রা নিজেরাই তৈরি করেছেন। অভিজ্ঞ মাস্টারমশায়দের সাথে আলোচনা করে। বোঝাই যায় বহু মাস্টারমশায়ের দীর্ঘকাল ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতার পুঁজি সংগ্রহ করে তৈরি এটি।

ওই পুস্তিকাটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের সেই ফিজিক্যাল অপটিক্সের মাস্টারমশায় বোধহয় এই পুস্তিকাটি দেখেছিলেন। কারণ পুস্তিকাটিতে যেভাবে ক্লাস নেবার কথা বলা আছে, বোর্ড-ওয়ার্কের কথা বলা আছে বা ক্লাসের জন্য প্রস্তুতি নেবার কথা বলা আছে তার অনেকটাই যেন ওনার পড়ানর মধ্য দিয়ে ফুটে বেরোত। পুস্তিকাতে বলা আছে যে এক ঘন্টার ক্লাসের জন্য ঘন্টা তিনেকের প্রস্তুতি নিলে ঠিক হয়। সময়ের হিসেব ঠিক করার জন্য পড়ানর বিষয়টি পুরো ভেবে নিলে ভাল হয়। বক্তৃতার মত করে রিহার্স

করে নিলে আরও ভাল। এবং গোটা লেকচারের বিষয়টা একবার লিখে ফেলা উচিত। তাতে বোর্ড-ওয়ার্কের হিসেবটাও তৈরি হয়ে যায়। বোর্ডের কোন জায়গায় কি লেখা হবে তার পরিকল্পনাটাও করে রাখা দরকার। কারণ অনেক সময়ই আগের লেখা জিনিষ ফিরে দেখার প্রয়োজন হয়। তখন ফের লিখতে গেলে অযথা সময় নষ্ট।

গত ৩রা জানুয়ারি প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্র মারা গেলেন। তাঁকে নিয়ে অনেক আলোচনা হল। শুনলাম। একজনের দেওয়া একটি তথ্য শুনে বড় ভাল লাগল। একজন জানালেন যে উনি যেকোনো অনুষ্ঠানে গান গাইবার আগের দিন, পরের দিনের অনুষ্ঠানে গাইবেন বলে যে গানগুলি ঠিক করতেন সেই সব ক'টি গান একটি খাতায় ধরে ধরে লিখতেন। তার সাথে আনুষঙ্গিক কিছু নোটও রাখতেন। ওঁনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার সমস্ত গানই তো কণ্ঠস্থ, তবু কেন প্রতিবারই অনুষ্ঠানের আগে আবার একবার লেখেন?' জবাবে তিনি যা বলেছিলেন তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। 'আসলে আর একবার যখন লিখি, তখন প্রতিটি অক্ষর লেখার সময় তার ভাবটা মাথায় নতুন করে গেঁথে যায়। তার ফলে স্টেজে গাইবার সময় এই ভাব আমার মাথায় এমনিই চলে আসে'। এমন একজন শিল্পী যিনি হাজার বার যে গান গেয়েছেন তিনিও অনুষ্ঠানের আগের দিন সেই গানের ভাবটিকে মাথায় গেঁথে নেবার জন্য এই কষ্টটা স্বীকার করতেন! এর থেকে শিক্ষণীয় আর কি হতে পারে? আমার কেবলই মনে হচ্ছে একজন শিক্ষককেও তো প্রতিদিনই ছাত্রদের সামনে নতুন করে পারফর্ম করতে হয়।

মনে পড়ে আমরা একজন আত্মভোলা গোছের মাস্টারমশায়ের কাছে পড়েছিলাম। খুবই ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। যেকোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে কাগজ-কলম নিয়ে চট জলদি সমাধান বাতলে দিতেন। কিন্তু ক্লাসে বোর্ড-ওয়ার্কের সময় কেমন দিশেহারা হয়ে পড়তেন। এখানে একটু লিখছেন। পরের অংশটুকু দূরে কোথাও লিখছেন। তারপর নিজেই সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিছু মোছার হলে হাতের চেটো দিয়েই মুছতে লাগছেন। তাতে চকের গুঁড়ো থেবড়ে গিয়ে বোর্ড আরও অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা এলোমেলো ব্যাপার চলতো। নোট নেওয়া বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আমরা চুপ থাকতাম। কারণ উনি পড়াতেন ভাল। আর মানুষটির তো তুলনা ছিল না। এই কাণ্ডটাই যদি একজন সাধারণ মাপের মাস্টারমশাই ঘটাতেন, তাহলে মুহূর্তে ভণ্ডুল হয়ে যেত তাঁর ক্লাস। ফলে এমন একটি নির্দেশিকা সাধারণ মাপের মাস্টারমশায়দের জন্য খুবই কাজের হতে পারে। যেটা তাঁকে ক্লাশরুমে অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

যেমন, একজন শিক্ষককে জানি যিনি খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ। যদিও ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয় তিনি। লক্ষ্য করে দেখেছি উনি ক্লাশে চোখ নামিয়ে থাকেন। এবং বেশির ভাগ সময় বোর্ডের দিকে তাকিয়ে লিখতে লিখতেই কথা বলেন। এই ব্যাপারে ওই পুস্তিকায় পরামর্শটি খুবই স্পষ্ট। বলা আছে যে কথা বলতে হবে ছেলেমেয়েদের চোখে চোখ রেখে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবার দিকে চেয়ে। পেছন ফিরে যত কম কথা বলা যায় ভাল। তা না হলে অনেক কথা শেষ বেঞ্চ অবধি পৌঁছয় না। ক্লাসের সময় দেখতে হবে যে, কথা যেন প্রত্যেকের কানে পৌঁছয়। তা না হলেই ছেলেমেয়েরা অমনোযোগী হয়ে পড়ে। আর বোর্ডের লেখার ব্যাপারেও নির্দিষ্ট পরামর্শ হল লেখার সাইজ এমন হতে হবে যেন শেষ বেঞ্চতে বসেও স্পষ্ট পড়া যায়। এজন্য মাস্টারমশায় যেন ক্লাসের শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখে নেন যে তাঁর লেখা তিনি নিজে পড়তে পারছেন। আর এও দেখে নেবেন যে আলোর প্রতিফলনের কারণে ক্লাসের ডান ও বাম ধারে বসা ছেলেমেয়েদের বোর্ডের লেখা পড়তে অসুবিধে হচ্ছে কিনা। হলে তার জন্য দরকারি ব্যবস্থা নেবেন। আসলে এমন সব আপাতভাবে ছোটখাট বিষয়ে মাস্টারমশায়কে মনোযোগ দিতে দেখলে ছেলেমেয়েদেরও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করে।

ক্লাশে প্রবেশ করা থেকে পড়া শুরুর মধ্যেকার সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একটু আগেই হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয় পড়িয়ে চলে গিয়েছেন আগের মাস্টারমশায়। তার জের তখনও কাটেনি। তারই মধ্যে আরেকজন শিক্ষককে ঢুকতে হয়। ফলে একটু থিতু হবার সময় দেওয়া দরকার। তা না করে মাস্টারমশায় ক্লাসে ঢুকেই যদি ছড়রা-গুলির মত করে জ্ঞান ছুড়তে শুরু করেন তাতে ছেলেমেয়েদের বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্যই বোধহয় কিছু কিছু মাস্টারমশায়দের দেখতাম ক্লাসে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে গল্পগাছা করতেন। সেদিনের বিশেষ কোনো খবর থাকলে তাই নিয়েই আলোচনা জুড়তেন। অথবা ছাত্রদের কারো ব্যক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতেন। ওই পুস্তিকাতে ঠিক এই ধরনেরই কিছু পরামর্শ দেওয়া ছিল। বলা রয়েছে যে এই ভাবে ছেলেমেয়েদের সাথে একটা নৈকট্য

গড়ে তুলতে পারলে পড়ানর কাজ অনেকটা সহজ হয়ে আসে।

এই মৈকট্য গড়ে তোলার ব্যাপারে মনে পড়ল আমাদের এক মাস্টারমশায়ের কথা। যিনি ক্লাসের সমস্ত ছেলেমেয়ের নাম মনে রাখতেন এবং পথেঘাটে-ক্লাসে যেখানেই দেখা হত তাদের নাম ধরে ডেকে কথা বলতেন। এটা আমাদের কাছে অবাক হবার মত ব্যাপার ছিল। পরবর্তীকালে ওনার সহকর্মী হিসেবে কাজ করেছি। তখন দেখেছি যে শুধু বর্তমান নয়, পুরনো ছেলেমেয়েদের নামও মনে রাখতেন তিনি। আর এই কারণেই কবে কে তাঁর কাছে পড়েছে তাঁরাও স্যারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এই বিশেষ গুণটির প্রয়োজনীয়তার কথা ওই পুস্তিকাটিতে উল্লেখ আছে। পড়শোনার ব্যাপারটি যেহেতু পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপার সেই কারণে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এমন আন্তরিক সম্পর্ক ব্যতিরেকে লেনদেনের কাজটি সার্থক হতে পারে না।

ছাত্রছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে থিয়োরি ক্লাসে যতখানি সুযোগ মেলে তার থেকে অনেক বেশি মেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সময়। সেসময় প্রতিটি ছেলেমেয়ের সাথে আলাদাভাবে কথা বলা যায়। যেকোনো বিষয় নিয়ে কথা বলা যায়। চাই কি ব্যক্তিগত বিষয়েও। এই সম্পর্কের কারণেই আমার নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের স্মৃতিগুলিই সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে পড়ে এমন এমন ব্যাচ ছেলেমেয়েদের পেয়েছি যারা সন্ধ্যে উতরে গেলেও ক্লাস ছাড়ার নাম করত না। ওখানে বসেই গল্পগুজব করতে করতে প্র্যাকটিক্যাল খাতা লিখত। তেমনই নির্দেশ থাকত। কাজ হয়ে গেলে রিপোর্ট দেখিয়ে সই করিয়ে ছুটি মিলত। অনেক সময় ওরা সন্ধ্যের পর একটু বেশি দেরি হয়ে গেলে এটা ওটা কিনে এনে খেত। আমার ঘরে ঢুকে আমার হাতেও একটা ঠোঙা গছিয়ে দিত। বলত আমরা খাচ্ছি, আপনিও খান, স্যার। কি যে ভাল লাগত তখন। অবশ্যি আমি কপট রাগের ভঙ্গি করে বলতাম, 'তার মানে এখন আমার বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না, তাই তো?' আমি জানি এর মধ্যে এমন ছেলেমেয়ে থাকত, যাদের বাড়ি বেশ দূরে। শেয়ালদা কি হাওড়া হয়ে যেতে হবে। আমি আমার ঘরে বসে ওদের গান গেয়ে গেয়ে ফুর্তিতে কাজ করার আওয়াজ শুনতাম। মনটা আনন্দে ভরে যেত।

আবার পুস্তিকাটির আলোচনায় ফিরে আসি। পুস্তিকাটি আকারে বিশেষ বড় নয়। পঞ্চাশ কি ষাট পৃষ্ঠা হবে। তাতে শিক্ষা বিষয়ে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা নেই। তবে একজন মাস্টারমশায়ের পড়ানর লক্ষ্যটা কি হবে তাই নিয়ে দু'চার কথা বলা আছে। দু'চার কথায় বলা হলেও এর মধ্য দিয়েই একটা কঠিন দাবী পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে পড়ান মানে ক্লাসে গিয়ে কিছু তত্ত্ব আর তথ্য আউড়ে আসা নয়। তত্ত্ব, তথ্য এসব তো আছেই, কিন্তু একজন মাস্টারমশায়ের লক্ষ্য হবে ওই বিষয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে আগ্রহী করে তোলা যাতে ওই জ্ঞান আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এরা কাজ করতে পারে। অধিত জ্ঞান স্বাধীনভাবে প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এজন্য শিক্ষকদের নিজেদেরও প্রস্তুত থাকার কথা বলা আছে। বলা হয়েছে নিজের বিষয়ে হালফিল অগ্রগতির খবর যেমন রাখতে হবে তেমনি অন্যান্য আর পাঁচটা বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।

এম.আই.টি. প্রকাশিত পুস্তিকাটির বার বার সপ্রশংস উল্লেখে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে থাকতে পারেন। কারণ তাঁরা বলবেন পড়ানর ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধিনতা থাকা উচিত একজন মাস্টার মশায়ের। সেখানে কোনোরকম খবরদারি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এক'শ শতাংশ সঠিক কথা। প্রত্যেক শিক্ষক তাঁর নিজের মত করেই পড়ানর কাজটা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তবুও আমার বিশ্বাস নতুন মাস্টারমশায়দের জন্য অগ্রজদের পরামর্শ তাঁদের ভাবনাকে পুষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে। সেই উদ্দেশেই পুস্তিকাটি রচিত বলে আমার মনে হয়েছে। তাই বার বার উল্লেখ করেছি। একজন শিক্ষক যিনি আন্তরিকভাবে নিজের কাজটি করতে চাইবেন, তাঁর কাছে পুস্তিকাটি খবরদারি করার জন্য লেখা হয়েছে বলে মনে হবে না। পুস্তিকাটির কোনো এক জায়গায় লেখা ছিল 'ভাল মাস্টার হয়ে কেউ জন্মায় না, ভাল মাস্টার হয়ে ওঠেন।

গ্রীন কম্পুটিং

বিপ্লব শিকদার

ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকে ছিল — "মানুষ ক্রমশঃ কৌশল ক্রমল"। অর্থাৎ আদিম মানুষ একসময় প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন করল। আগুন আবিষ্কার করল, অস্ত্র বানাতে শিখল। অস্ত্রের প্রয়োগে পশুবধ এবং আগুনের সাহায্যে খাবারে পোড়া মাংস। মানুষের 'কৌশল' জানবার এই 'জিন' সময়ের সাথে সাথে উন্নত হয়েছে। এবং পরিশেষে ভয়ানক হয়েছে।

অভিজ্ঞ কৌশলী মানব কূলের সাম্প্রতিক আবিষ্কার হোল 'Computer' — অর্থাৎ যন্ত্রগণক, যার দ্রুত বিবর্তন এখন চিন্তার কারণ। যদিও 'Computer' শব্দটি নেওয়া হয়েছিল ল্যাটিন শব্দ 'Computare' অর্থাৎ 'Calculate' বা 'Count' থেকে তবে এখন এটি প্রায় সব কাজেই লাগে। এই 'Computing' (গণনার) কাজ শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব 30,000 অব্দে। Co-Magnon মানুষেরা এর আবিষ্কর্তা। তার পরের রূপ 'abacus' — Babylonia —তে (3000 BC)। অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে এল চার্লস Babbage-এর গণকযন্ত্র, Difference Engine, ঊনবিংশ শতকের গোড়ায়। উনিই আধুনিক Computer-এর জনক। এরপর সময়ের সাথে প্রাকৃতিক নিয়মে গণকযন্ত্রের উন্নতি সাধন ঘটেছে। এর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল বিশ্বযুদ্ধের সময় (1930-এ)। তৈরী হোল প্রথম Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC).

Computer -এর সর্বব্যাপী ব্যবহার অনুভূত হতে থাকে বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই। এরপর সময়ের দাবী মেনে আবিষ্কৃত হোল transistor (1947), microprocessor (1971), ইত্যাদি ইত্যাদি, এই কাজে অক্সিজেন জুগিয়েছে Von Neumann -এর (1946 - 48) সরল সাধাসিধে Computer architecture আমরা এখনও এটি অনুসরণ করে চলেছি।

ENIAC (US Army যেটা তৈরী করেছিল)-এর ওজন ছিল 30 টন। জায়গা নিত 15,000 বর্গফুট (এক হাজার বর্গফুটের 15 টি ফ্ল্যাটের সমান)। এটির জন্য বিদ্যুৎ খরচ হোত 100 Watt এর 2000 টা বাল্বের সমান। বিনিময়ে এর কাছ থেকে পাওয়া যেত মোটামুটি ভাবে প্রতি সেকেন্ডে 5000 যোগ-বিয়োগ।

বর্তমানে আমাদের চাই 'zero weight', 'zero size', এবং 'low power'। অর্থাৎ অত্যন্ত কম ওজনের ছোট্ট processor/computer। যার জন্য বিদ্যুৎ খরচ হবে খুব কম এবং এটি প্রতি সেকেন্ডে 10^{15} operations (**1 Peta Flops**) করবার ক্ষমতা রাখবে। আমরা কৃত্রিম মানুষ গড়তে চাই।

আমাদের স্বপ্নপূরণ হবে 2020-এর মধ্যেই। দেখা যাবে ছোট্ট মাথার মানুষ Mr./Ms. X Processor (Surname)। এঁরা আমাদের প্রতিবেশী হবেন। আমাদের দুঃখে কাঁদবেন। সাধারণ মানুষের মত আবেগ প্রবণ হবেন ও পরোপকার ব্যস্ত থাকবেন। তফাৎ একটাই-এঁরা রক্ত-মাংসে গড়া নন, তাই নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন। 2030-এর বাজারে পাওয়া সম্ভব হবে তেরঙ্গা, কাস্তে বা পদ্ম মার্কা Chip (Processor)। যে কোন মুহূর্তে রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ঠিক করতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক করতে হবে না। একটা গোষ্ঠীর সম্মিলিত ক্ষমতার অধিকারী হবে একটা Processor। এসবই সম্ভব হবে Moore-এর সূত্র অনুসারে। Gorden Moore (1965) বলেছিলেন "Compaction density of function within a chip will be doubled every 18 to 24 months"।

কিন্তু লাগামহীন এই এগুনোর সমস্যা হোল নিউটনের তৃতীয় সূত্র "প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে"। উন্নত প্রযুক্তি সর্বস্তরে উচ্চক্ষমতার যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করছে। ঘটছে শক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এর প্রতিক্রিয়া পরিবেশে। বেড়ে চলেছে কার্বন-ফুট-প্রিন্ট। উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন Computer এবং তার ব্যবহারে শক্তি জোগাতে নষ্ট হচ্ছে খনিজ সম্পদ — পরিবেশে বাড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ।

অন্যসব বাদ দিলেও শুধু Spam ই-মেলের জন্য পৃথিবীতে বিদ্যুৎ অপচয় হয় 3300 কোটি ইউনিট (Kwh)। যা দিয়ে নিশ্চিন্তে ভারতবর্ষের প্রতিটি পরিবারে বিদ্যুতের জোগান দেওয়া সম্ভব। একটি Spam ই-মেলের জন্য খরচ হওয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা মানে পরিবেশে অতিরিক্ত 0.3 গ্রাম CO_2 ছড়ানো। এর অর্থ সারাবছরে Spam ই-মেল ততটাই অপচয় এবং ক্ষতি করে যতটা 16 লাখ সাধারণ ছোট গাড়ি পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করলে হতে পারে।

একটা সাধারণ 200 watt-এর PC অফিসে প্রতিদিন আট ঘন্টা চালু থাকলে বছরে বিদ্যুৎ খরচ প্রায় 400 ইউনিট (এক সপ্তাহ অর্থে 5 দিন এবং বছরে 50 সপ্তাহ) — যা পাওয়া যায়

প্রায় 220 কেজি CO_2 -এর বিনিময়ে। 2010 সালে ভারতে প্রায় আট কোটি Computer বিক্রীর সম্ভাবনা। যা সরাসরি প্রতি বছর প্রায় 1.8 কোটি টন উদ্বৃত্ত CO_2 -এর জন্য দায়ী থাকবে।

সরাসরি computing ছাড়াও বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার হয় data centre-এ। বিদ্যুতের অপচয় কমাতে আবার চাই ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা। যার অর্থ — চাই আরও বিদ্যুৎ।

পৃথিবীতে শুধুমাত্র Computer ব্যবহারের জন্য বছরে বিদ্যুৎ খরচ 15,00,000 কোটি টাকা। এর মাত্র 15 শতাংশ কাজের কাজে, বাকিটা নষ্ট। অপচয়ের এই বিলাসিতা অন্য আর কোন ক্ষেত্রে ঘটে এমনটা শোনা যায় না।

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ খরচ ছাড়াও Computing যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ভীষণ রকম পরিবেশ দূষণ সহায়ক। Computer-এর প্রায় প্রত্যেকটি অংশে বিষাক্ত দ্রব্য ছড়ায় আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে— যেমন দস্তা, তামা, পারদ, টিন, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সিলিকন, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ইত্যাদি ইত্যাদি। কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র মাটিতে মেশানো দস্তার 5 ভাগের মধ্যে 2 ভাগের জন্য দায়ী। এমনকি বিপুল পরিমাণে পারদ (যা মস্তিষ্কের পক্ষে ভীষণরকম ক্ষতিকারক) ব্যবহারও (1997 থেকে 2004 এ প্রায় 200 টন) চিন্তা বাড়িয়েছে সকলের। এছাড়াও রয়েছে ক্যাডমিয়াম এবং লক্ষ লক্ষ টন প্লাষ্টিক। 1997-2004 -এ কিডনির শত্রু এই ক্যাডমিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় 1000 টন।

একটা Chip তৈরীতে কমবেশী প্রায় 400 টি ধাপ আছে। যে পরিমাণ chip তৈরী হয় তার জন্য প্রায় দশগুণ জৈব জ্বালানী লাগে। একটি CRT -এর জন্য 240 কেজি কিম্বা LCD মনিটরের জন্য চাই 226 কেজি জৈব জ্বালানী। এর অর্থ, Computer সরঞ্জাম উৎপাদন মানে ভীষণভাবে Corbon-foot--print বাড়িয়ে তোলা।

1997 থেকে 2004 পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে 1200 কোটি টন Computer সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়েছে। এই একই সময়ে বাতিল কম্পুটারের সংখ্যা প্রায় 32 কোটি। তখন একটি কম্পুটার গড়ে প্রায়– 5 বছর ব্যবহার করা হোত। এখন কম্পুটারের গড় ব্যবহারিক আয়ু মাত্র 2 বছর বা তার কম। এরফলে বাতিল (বর্জ্য) Computer -এর পরিমাণ এখন প্রতিবছর গড়ে 5 কোটি টনেরও বেশী। এই বর্জ্য (e-waste) বিষাক্ত এবং পৃথিবীর মোট বর্জ্যের 5 শতাংশ। অবশ্য অন্যান্য বর্জ্যের মত এটা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো নয়। আপাতত উন্নত দেশগুলির গন্তব্য চিন। e-waste পাচার হচ্ছে চিনে। আমরা অবশ্য বর্জ্য নিয়ে বর্ডারে যাব। তারপর সুযোগ বুঝে পাকিস্তানে। এতেই যথেষ্ট ক্ষতি করা যাবে প্রতিবেশীদের। এখন পৃথিবীর আশি শতাংশ (80%) Computer e-waste চিন ও পাকিস্তানে জমছে। পৃথিবীর বহু দেশে Mobile Van-এ domestic বর্জ্য সংগ্রহ করে, চাপ দিয়ে মন্ড তৈরী করে, নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যের জন্য এ নিয়ম চলে না। e-waste চাপের কাছে নত হয় না।

তবে সুখবর আছে। আমরা মনযোগী হচ্ছি। নজর দেওয়া হচ্ছে 'Green Computing'-এ। যার শর্ত হোল 3R-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা। অর্থাৎ —

(R)educe your Carbon-foot print, (R)euse, এবং (R)ecycle। যেমন 200W-এর সাধারণ PC-এর বদলে বাজারে আসছে 30W Green PC। বিদ্যুৎ খরচ কমবে—কমবে Carbon foot print। কম খরচে প্রচুর Computation করার জন্য ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি মেনে নিচ্ছে Grid computing ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় রাখা Computer গুলির নেটওয়ার্ক তৈরী হচ্ছে যাতে সকলেই এগুলিকে share করতে পারে।

Green Computing প্রকৃত অর্থে পরিবেশ বান্ধব Computing। এর লক্ষ্য হোল— (i) "Maximize energy efficiencey during product life cycle" এবং (ii) "Promote biodegradability of defunct products and facny waste"। এবার থেকে যে কোন 'product'-এর উৎপাদন, সঠিক ব্যবহার এমন কি 'defunct products' -এর disposal-এর দায়দায়িত্বও বর্তাচ্ছে উৎপাদনকারী সংস্থার উপর। অর্থাৎ ট্রেনে চা বেচে সরে পড়া যাবে না। চা পানের পর ব্যবহৃত ভাঁড় সংগ্রহ ও তা সঠিক স্থানে ফেলার দায়িত্বও চাওয়ালাকে নিতে হবে।

Green Computing-এর সমাধান সূত্র হিসেবে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হোল —

1) শক্তির অপচয় নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য (1996) ACPI (Advanced configuration and power interface) standard। ব্যবহার হচ্ছে PBDE-Free প্লাষ্টিক, lead-free soldering, organic transistors (OLET)। চালু হয়েছে VIA Technology ও VIA Treemark rating systeem। একটা processor যতটা CO_2 নির্গমন করে তা শোষণ করতে সক্ষম তেমন সংখ্যক গাছ লাগানো হচ্ছে উৎপাদনকারী সংস্থার প্রচেষ্টায়।

2) জিনিষের ব্যবহারিক আয়ু বাড়ানো এবং 'defunct product'-এর অংশ বিশেষকে পূর্ণনবীকরণ যোগ্য করে তোলা।

3) আইন প্রনয়ণ এবং সঠিক প্রচেষ্টা।

আমেরিকার Environmental Protection Agencey 'energy star' চালু করেছে 1992 তে। এর লক্ষ্য হোল মনিটর,

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 'energy efficient' design উৎসাহিত করা। এধরনের উদ্যোগগুলো আরও প্রচেষ্টা চলছে। যেমন climate Servers Computing Initiative (CSCI), Green Computing Impact Organization (GCIO) ইত্যাদি। এরা 2007 সালে প্রথম PC এর বিদ্যুৎ খরচ কমানোর উদ্যোগ নেয়। এই 2007 সালেই স্থাপিত হয় Green grid। এটি একটি consortium। যাতে যোগ দিয়েছে HP, Dell, IBM, Intel, Microsoft, SUN এর মত সংস্থাগুলি। উদ্দেশ্য হোল Data centre গুলোতে বিদ্যুৎ অপব্যবহারে রাশ টানা।

উল্লেখ করা যেতে পারে শুধু 'google'-এরই বৃহৎ data centre -এর সংখ্যা কম করে 12-টি (আমেরিকাতে)। এছাড়া আছে হল্যান্ড বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশে। Dalles, Oregon এর data centre টি ফুটবল মাঠের দ্বিগুণ আয়তনের। এর cooling tower চারতলা বাড়ীর সমান। 2011-তে এই centre-এর বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে 103 MW পৃথিবীর সব data center গুলির সম্মিলিত বিদ্যুৎ খরচ আমাদের মত একটা দেশের বিদ্যুতের যোগানের চাইতে বেশী।

ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র ক্ষতিকারক বস্তু এবং ভারী ধাতুর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে European Union বিভিন্ন নির্দেশিকা দেয়। এরমধ্যে 2002/95/EC (Rotts), ক্ষতিকারক বস্তু সংক্রান্ত, এবং 2002/96/EC WEEE (Waste electrical and electronic equipment) মেনে বাজারে 'Product' আনছে সংস্থাগুলি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা — বিশেষ জল খরচ নেই চেষ্টা চলছে। অনেক উপায়ের একটি হোল Algorithm এর efficiency বাড়ানো। যেমন বর্তমানে google -এ 100 টি search-এর জন্য google data centre-এ বিদ্যুৎ খরচ এক ইউনিট (carbon footprint 6/7 গ্রাম। যদিও google এর মতে 0.2 গ্রাম)। google দিনে এরকম 40 কোটি 'query' process করতে পারে। সুতরাং উপযুক্ত পরিকাঠামোর সাথে সাথে Efficient algorithm চাই যা এই খরচ কিছুটা কমাতে পারে।

Green Computing ভাবনার সূচনার বহু আগে থেকে কিছু সরল (Innocent) পদক্ষেপ Computing-এ শক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেছিল। 60-এর দশকে Time sharing system-এর উদ্ভাবন এমনই একটি পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থায় computer-এর অলস সময় বলতে কিছু রাখা হয়নি, পাকা দশভুজ মত কাজ করে processor। একই সাথে বিভিন্ন কাজ করে নিচ্ছে। 'মা কালী' যেন— ছুটে ছুটে বিভিন্ন মন্ডপে একই সময়ে (রাত দশটায়) পুজো নিচ্ছেন।

কিছু সফটওয়্যার পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি। যেমন windows vista windows 2007 এগুলি power efficient— windows 2000 বা windows XP -র থেকে। বেশী power খরচের hard disk বদলে আনা হয়েছে ছোট hard disk (2.5 inch), solid state drive, flash memory / DRAM.

এসবের মূল মন্ত্র হোল KISS অর্থাৎ "Keep it Simple and Stupid/Small/Short/Straightforward।

বর্তমান Computing এর জন্য বিদ্যুৎ খরচ কমানোর প্রচেষ্টার সাথে চলছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ যাতে বিদ্যুতের অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এর পাশাপাশি পরিবেশে CO_2-এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। এক ইউনিট (1000 watt-hr) বিদ্যুৎ কয়লা থেকে পাবার জন্য পরিবেশে প্রায় 900 গ্রাম CO_2 ছাড়তে হয়। গ্যাস থেকে বিদ্যুতের জন্য CO_2 এর পরিমাণ 600 গ্রাম। অথচ বায়ুশক্তি বা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে CO_2 এর পরিমাণ 20 গ্রামেরও কম প্রতি ইউনিটে, যদিও পরমাণু বিদ্যুতের Carbon-foot-print জলবিদ্যুতের প্রায় সমান — কিন্তু পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প নানাবিধ ধ্বংসাত্মক সমস্যার কারণে পরিহারযোগ্য।

এই পৃথিবীর প্রত্যেক নাগরিক প্রকৃতিতে CO_2 (Carbon-foot-print) বাড়িয়ে চলেছে — সরাসরি (primary-foot-print) এবং পরোক্ষ ভাবে (secondary-foot-print)। তবে আমাদের মত দেশের সাধারণ নাগরিকের foot-print একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। গড় ইউরোপীয় নাগরিক সাধারণত বছরে 1 কোটি টন CO_2 এর জন্য দায়ী। আমেরিকায় এটি 4 গুণ (4 কোটি টন)।

বিশ্বজুড়ে Carbon Credit নিয়ে সংঘাত শুরু হয়েছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয় যখন প্রতিটি মানুষের জন্য চালু হবে PAN-Card-এর মত Carbon-foot-print / credit card। রেস্টুরেন্টে খাবার অর্ডারের সময় Credit-card-এর পাশাপাশি সাথে রাখতে হবে Carbon-foot-print cardও। প্রতিটি শিশু জন্মাবে বিশ্বশান্তির অংশের বোঝার সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া Carbon-credit এর বোঝা নিয়ে।

তবে এতসবের মাঝেও আশার আলো দিচ্ছেন আমাদের সূর্যমামা সৌরবিদ্যুৎ আমাদের দুশ্চিন্তা কমাচ্ছে। আমাদের দেশের শহরগুলিতে বহু ক্ষেত্রেই হোর্ডিং/বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। Computing এর জন্যও সরাসরি এর ব্যবহার নিশ্চিত হতে চলেছে। 'PC-1' উদ্যোগ এর উদাহরণ যেখানে solar powered devices-এর প্রচলন হবে

এমনিতেই একটি PC-এর জন্য প্রতিবছরে 220 কে.জি. CO_2-এর দায় কমিয়ে 70 কে.জি-তে আনা হচ্ছিল। PC-1 তা আরও অনেকটাই কমাবে। Intel সহ অন্যান্য সংস্থাগুলি বসে নেই। তারা এখন Green Computing নিবেদিত প্রাণ। VIA'S Solar Computing এরকমই একটি প্রচেষ্টা। এর সফল প্রয়োগে সুবিধে হবে আমাদের মত প্রখর সূর্যের দেশগুলির, যদি না আমাদের রাজনীতিবিদরা সূর্যিমামার এই দানকে অন্যের হাতে অর্পণ করেন।

ভারতবর্ষ Green energy-র দেশ। এই শক্তির সূত্রগুলি হোল-সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, Biomass ইত্যাদি ইত্যাদি। আন্তরিক হোক বা না হোক ভারতের অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক (প্রতিষ্ঠা প্রথমে 1982 তারপর পাকাপাকি 1992)-এর উদ্যোগে ভারতবর্ষ বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে পৃথিবীতে পঞ্চম (10,464 MW)। বর্তমানে ভারতে প্রায় 7 লক্ষ (মোট 44 MW ক্ষমতার) solar photovoltaic system ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারতের লক্ষ্য 2030-এর মধ্যে 200 GM পুনর্নবীকরণ যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন। বাস্তবে এর পরিমাণ অনেক বেশী হবে। এর একটা বড় অংশই আসবে সৌর শক্তি থেকে। হয়ত computing-এর জন্য একমাত্র এই শক্তিই লভ্য হবে। ভারতের মত সূর্যের দেশগুলি computing-এ হবে অত্যন্ত ধনী। ছোট্ট মাথার Mr./Ms. X processor রা আজকের উন্নত দেশগুলি পরিহার করবেন। কাজের জায়গা হিসেবে শুধু আমাদের মত দেশকেই উপযুক্ত ভাববেন। Mr. ও Ms X Processor প্রতিদিন নিয়ম করে solar cell মাথায় দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণে বেরোবেন শুধুমাত্র আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায়।——.

মঙ্গলগ্রহের ঝড়ের গল্প ঃ আর এক মঙ্গলকাব্য !

নিখিলেশ পাল

" উদিল মঙ্গল লগনে
মঙ্গল মধুর আলোকে
ওরে উদার দীপ দীপিয়া"..........

(রবীন্দ্রনাথ)

আকাশে অনিয়মিত ও অস্থিরগতির লাল জ্যোতিষ্কটিকে প্রাচীনকালের মানুষেরা অশুভ, বিদ্বেষপূর্ণ ও উগ্র বলে চিহ্নিত করেছিল। গ্রীকরা তুলনা করেছিল এরেস নামক যুদ্ধের দেবতার সঙ্গে, ব্যাবিলনীয়েরা নামাঙ্কিত করেছিল পাতালের দেবতা 'নেরগাল' এর নামে, প্রাচীন চাইনিজরা বলত ঝিং হুও (Ying-huo) বা আগুন গ্রহ অর্থাৎ ফায়ার প্ল্যানেট। কিন্তু মুনি ঋষিদের দেশ ভারতীয়দের কাছে সে মঙ্গলেরই প্রতীক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই ভারতীয় শব্দটিকে সম্মান জানিয়ে নাসা (NASA) মঙ্গলগ্রহের একটি অঞ্চলের নাম রেখেছে 'মঙ্গলা ভ্যালেস'।

১৯৯৭ সালে, মঙ্গলের বুক থেকে ২৪০ মাইল উচ্চতার কক্ষপথে পাঠানো 'মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার' নামের কৃত্রিম উপগ্রহটির, ঈগলের চোখ নিয়ে ম্যাগনেটোমিটার, লেসার অলটিমিটার, থার্মাল এমিশন স্পেকট্রোমিটার, ইলেকট্রন রিফ্লেক্টোমিটার, অরবাইটার ক্যামেরা, হরাইজন সেন্সার ইত্যাদি যান্ত্রিক 'অলঙ্কারে' সজ্জিত হয়ে দীর্ঘ চার বৎসর ধরে পাক খেয়ে খেয়ে মঙ্গলের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের এক সার্বিক মানচিত্র (গ্লোবাল পোর্ট্রেট) তৈরি করল।

কম্পিউটার স্ক্রিনে ফুটে ওঠা ঐসব ছবি দেখে নাসার বিজ্ঞানীরা তো হতবাক। যেন "......বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।" মঙ্গল অভিযানের দায়িত্বে থাকা নাসার এক মুখ্য বিজ্ঞানী জিম গারভিন্ অপলক চোখে এইসব ছবি দেখে মোহিত হয়ে তো আনন্দে কেঁদেই ফেললেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের কথা বাদ দিয়ে কিছু ছবি যেন প্রকৃতির-ই এক ঝকমকে প্রদর্শনী।

'মার্স ওডিসি' নামের আর একটি উপগ্রহ পরবর্তীকালে নিউট্রন স্পেকট্রোমিটার দিয়ে মাটির মিটার খানেক গভীরে হাইড্রোজেনের পরিমাণ মেপে খোঁজ পেল সেখানে রয়েছে চাই চাই বরফ অর্থাৎ যতই হাইড্রোজেন পরমাণুর 'তীব্রতা' ('ঘনত্ব') যন্ত্রে ধরা পড়ল, ততই জল বা বরফের 'লুকানো' উপস্থিতি প্রমাণিত হল। লেসার অলটিমিটার ও গ্রাভিটি সেন্সর দিয়ে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা ১২৫ মাইল চওড়া ও প্রায় ১০০০ মাইল লম্বা শতশত কোটি বছর আগের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া 'নদী বও (আকৃতিতে ইংলিশ চ্যানেলের মত কিছু একটা ?) হদিশ পাওয়া গেল।

'মৃতক' মঙ্গলের সার্বিক বা গ্লোবাল চৌম্বক ক্ষেত্রের নামমাত্র অবশেষ (জীবন্ত ফসিল) হিসাবে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কিছু চৌম্বক গুণ সম্পন্ন পদার্থেরও সন্ধান মিলেছে সার্ভেয়ারের ম্যাগনেটোমিটারে।

মঙ্গলাকাশে প্রবল ঝড়ের সময় উড়ন্ত ও উত্তপ্ত ধুলোবালি থেকে বিকিরিত হওয়া তাপ-তরঙ্গের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে 'থারমাল এমিশন স্পেকট্রোস্কোপ'টি ঝড়ের গতিপ্রকৃতি, স্থায়িত্ব, ব্যাপ্তি ও তীব্রতার পরিমাপ করেছে।

পৃথিবীর দুই মেরুর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য যেমন বৈপরীত্য-মঙ্গলেরও তাই। ১.৭ মাইল উচ্চতার, ৭৫০ মাইল ব্যাসের ধুলো মেশানো 'জলের বরফ' এর পাহাড় (পোলার আইস ক্যাপ) উত্তর মেরুতে। তার মাঝে আধ মাইল গভীর গিরিখাত এখনও ব্যাখ্যার অতীত। অধিকতর শীতল দক্ষিণ মেরু ঢাকা রয়েছে, আয়তনে ৩ গুণ ছোট ফ্রজেন কার্বনডাই অক্সাইড বা 'ড্রাই আইস' দিয়ে।

প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর বয়স ছুঁয়ে যাওয়া বর্তমান এই লাল গ্রহটির যৌবনকালে অর্থাৎ প্রাক-সৌরমণ্ডলীয় শূন্যতায় তার সৃষ্টির ১০০ কোটি বছর পর গোটা শরীর জুড়ে তার ভূতাত্ত্বিক উপাদানে এক উথাল পাথাল অবস্থা। ভূত্বক বা বহিরাবরণ ছিল অত্যন্ত সক্রিয়, উগ্র। চতুর্দিকে অসংখ্য আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। মুষলধারে উল্কাবৃষ্টি ও কখন কখন গ্রহাণু বা অ্যাস্টারয়েডের আঘাতে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ছোট বড় গহ্বর বা ক্রেটার্স। কাদামাখা বন্যায় মাটি (?), পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে লম্বা, চওড়া খাল তৈরি হচ্ছে আবার তা জুড়ে জুড়ে জাল বুনছে। হয়তো বা আমাদের সুন্দরবনের নদীগুলোর মত কোনো নেটওয়ার্ক।

কিছুকাল পর পাথরের স্তরবিচ্যুতি ও ধস নেমে বিষুব অঞ্চলের কাছে শাখা প্রশাখা সমন্বিত আড়াই হাজার মাইল লম্বা ও বেশ গভীর যে গিরিখাতের উদ্ভব হল তার পাশে পৃথিবীর 'গ্রান্ড ক্যানিয়ন' তো কোন তুলনায় আসেনা। মঙ্গলের ভূগোলে তার নাম 'ভ্যালেস মেরিনারিস'। অবিরাম উত্তপ্ত, গলিত

লাভাস্রোত বিষুব অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, জমে, ঠান্ডা হয়ে সৃষ্টি হল এক বিস্তীর্ণ পাথুরে অঞ্চল।

ওদিকে তীব্র বায়ুস্রোত, বিপুল পরিমাণ বালি আর ধুলো বয়ে নিয়ে ভরিয়ে দিল গহ্বরগুলোর গর্তে। যতদূর দেখা যায় শুধু বালি আর বালিয়াড়ি বা ডিউন ফিল্ডস্।

অনেক মিল গড়মিলের মাঝেও পৃথিবী তার দ্বিতীয় নিকটতম এই গ্রহটির সাথেই আত্মীয়তার নৈকট্য অনুভব করে প্রথমটি শুক্র-মাপে ও 'ওজনে' পৃথিবীর সমগোত্রীয় হলেও পৃথিবীর থেকে ৯২ গুণ বেশি বায়ুমন্ডলীয় চাপে ঠাসা কার্বনডাই অক্সাইড, আর হালকা হলুদ ঝাঁঝালো সালফিউরিক অ্যাসিড-গ্যাসের মেঘ দুরন্ত গতিতে পাক খাচ্ছে বায়ুমন্ডলের উপরে। বিষবাষ্পে ভরা এই ঘন, অস্বচ্ছ গ্যাসিয় অবগুণ্ঠন সরিয়ে কোনোদিন দেখায়নি তার পাথর ও মাটির মুখমন্ডলকে : প্রাকৃতিক ভাবেই গ্রীন হাউস এফেক্টে তার শরীরের তাপমাত্রা ২৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর 'ঠাকুরদাদা'। ভোরের ও সন্ধ্যাকাশের এই উজ্জ্বলতম গ্রহটির গ্যাসিয় বলয় থেকেই ঠিকরে আসা সূর্যালোক। তাই প্রধান কবিও আবেগে লিখেছিলেন 'তুমি প্রভাতের শুকতারা, /আপন পরিচয় পাল্টিয়ে দিয়ে কখনও বা তুমি দেখা দাও গোধূলির দেহলীতে।'আর মেয়েলী ব্রতের ছড়ায়, - 'সন্ধ্যামণি কনকতারা। /সন্ধ্যামণি জলের ঝারা।' দীপ্তিময়ী শুকতারার 'বাহিরের' রূপ সবদেশের মানুষকেই মুগ্ধ করেছে ১৯৭০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রাশিয়ার স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগার (মহাকাশযান) ভেনাস-৭ শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে তার বিষাক্ত বায়োস্ফেয়ারের ব্যাপারে প্রথম বেতারবার্তা পাঠায় পৃথিবীতে। গত চার দশকেই এসব কিছু জানা গেল। তবুও রোমান মাইথোলজিতে সে 'ভেনাস' – প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সমুদ্রতরঙ্গের ফেনপুঞ্জ থেকে আবির্ভূতা দিব্যকান্তিময়ী এক রূপসী। দক্ষিণ সমীরের দেবতা জেফার তাঁর প্রণয়ী 'সেই অ-যান্ত্রিক যুগে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা মঙ্গলের মাধুর্যকে মাপতে পেরেছিলেন তাদের 'দূরদৃষ্টি' ও মেধা দিয়ে, তাই তারা গ্রহটির বদনাম দেয়নি। বলা যেতে পারে ' হোয়াট ইস্ট থিংস্ টু-ডে, ওয়েস্ট থিংক্স টু-মরো'।

মঙ্গলগ্রহে যে এখন কোনরকম প্রাণের অস্তিত্বই আর নেই, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত। কিন্তু অতীতের মঙ্গলভূমিতে জীবনসৃষ্টির সম্ভাবনা সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণেই এখন ব্যস্ত নাসা'র পাঠানো মহাকাশযানগুলো। আধুনিক মঙ্গলে শৈবাল ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জাতিয় কোন অনুজীবের সন্ধান পাওয়া গেলেও ধন্য হয়ে যাবে বিজ্ঞানীকুল। বহু বহু কোটি বছর আগেই গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ বা উপরিতল থেকে সব তরল জল (যেমন পৃথিবীর সাগর, নদী, হ্রদ ইত্যাদী) বাষ্পীভূত হয়ে উবে গেছে যদিও জনপ্রিয় বিজ্ঞানের পাঠকরা অনেকেই বলে থাকেন, 'এখন তো বায়ুমন্ডলও নেই তার'। চাঁদ বা ক্ষুদে বুধ গ্রহের মত মঙ্গল মোটেই বায়ুশূন্য নয়, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের গড় অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের ১৬৮ গুন পাতলা মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের যে টুকু আছে তার ৯৫ শতাংশই কার্বন ডাই-অক্সাইড, ৩ শতাংশ নাইট্রোজেন দেড় শতাংশ আর্গন আর শুধু একটু 'গন্ধ শোঁকার' মতো, ছিটে ফোঁটা অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প ও মিথেন মিলে আধ শতাংশ মঙ্গলের গ্যাসিয়-বলয়ের ভর পঁচিশ লক্ষ মেগাটন। পৃথিবীর বায়ুমন্ডল তার চেয়ে ২০৬ গুণ ভারী। মঙ্গলের বায়ুমন্ডল যে কত পাতলা একটি তুলনায় তার চিত্র ফুটে উঠতে পারে:পৃথিবীর ৩৫ কিমি উচ্চতায় বায়ুমন্ডলের যে অতি ক্ষীণ চাপ, তা মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুচাপের সমান।

ওজোনস্তর ও পৃথিবীর মত চৌম্বক বলয় না থাকায় প্রচুর পরিমাণে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির আগমনেই হয়তো মঙ্গল-মাটি প্রাণ সৃষ্টির প্রধান অন্তরায়। মঙ্গলের বিষুব অঞ্চলের কাছাকাছি রয়েছে সৌরমন্ডলের সর্বোচ্চ ও মৃত আগ্নেয়গিরি - পাহাড়, ১৩ মাইল উচ্চতার অলিম্পাস মনস্; যা এভারেস্টের আড়াইগুণ। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সমুদ্রের তলা থেকে ওঠা মওনা লোয়া (Mauna Loa) নামের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরিটি মাত্র সাড়ে পাঁচ মাইল উঁচু। অলিম্পাস মনস্ এর চূড়াই হল সৌরমন্ডলের সর্বোচ্চ স্থান।

শীতকালে বায়ুমন্ডলের ২৫ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড 'চলে যায়', দক্ষিণমেরু অঞ্চলে শুকনো বরফ-এ (ড্রাই আইস) রূপান্তরিত হতে। তখন বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ বেশ কমে যায়। বসন্তের শেষ থেকেই শুরু হয় ওই বরফে'র সরাসরি বাষ্পীভূত হয়ে (সাবলিমেশন) বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ফিরিয়ে দেবার পালা, তা চলে গোটা গ্রীষ্ম জুড়ে। জলের বরফটা (এইচ-টু-ও) চিরন্তন:থেকেই যায় পোলার আইসক্যাপ হয়ে। ঐ দক্ষিণ মেরু-বরফের প্রায় সবটাই ড্রাই-আইস বা ফ্রজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড।

লালচে ফেরিক অক্সাইডের ঘন ধুলো (আসলে মরচে = জল বা জলীয় বাষ্প + লোহা, তাই সন্দেহ মঙ্গলে অতীতে অনেক জল ছিল) মেশানো বালির ঝড়ে আকাশ ছেয়ে যায়। কখনও অনেকগুলো আঞ্চলিক ঝড় (লোকাল) বিভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে সৃষ্টি হয়ে, পরে একত্রে মিলে একটা গ্লোবাল ধুলোঝড়ের রূপ নেয়। চলতে থাকে দু'মাস ধরে। এই তান্ডবের

সময় ঐ লাল ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে ঢুকতে পারে না সূর্যদেবও। 'সেই সময়' মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠে ধূসর অন্ধকার নামে। সত্যিই যদি মহাকাশচারীরা কোনোদিন (যা নাসার ২০২০'র পরিকল্পনা) যায় সেখানে, তারা ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখবে দিন নয়, রাত নয়, 'সন্ধ্যা'র মত এক অচেনা-অন্ধকারে মঙ্গল ডুবে আছে ঐ দু'মাস কাল। তবে ১৮ মাসের মঙ্গল অভিযানে (যাতায়াত মিলে) চামড়ার শরীরে মহাজাগতিক বিকিরণের ঝুঁকি কি হতে পারে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বিকিরণ-বিশেষজ্ঞরা (স্পেস- রেডিওলজিস্টরা)। মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ মান-এর (পৃথিবীর এক দশমাংশ ভর হওয়ায়, "g" এর টান তো খুব পলকা) জন্মগত দুর্বলতায় ধূলোবালি একবার উড়ে গেলে দীর্ঘদিন সহজেই ভেসে থাকে। যেমন পৃথিবীর মেঘেরা অলস, উদাসীনতায় অনেকদিন ভেসে বেড়ায় হাওয়ার স্রোতে। পৃথিবী থেকে দূরবীনের চোখে মঙ্গলের আকাশ-রাঙিয়ে তখন যেন হোলি উৎসব। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তা উপভোগ করেন। সাম্প্রতিকতম শেষ গ্লোবাল ডাস্টস্টর্ম হয় ২০০১-এর ২৬ জুন থেকে ১৯ অগস্ট। ধুলো-মেঘ ফুঁড়ে মঙ্গলের সুউচ্চ চারটি আগ্নেয়গিরির মাথাকে (চূড়া) টেলিস্কোপে দেখা গেছে কালো বিন্দুর মতো। একটা চিত্র কল্পনা করা যেতে পারে; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বা মহাদেশে প্রায় একই সময় কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ঝড়ের উৎপত্তি হল (লোকাল)। তারপর তারা কিছুদিনের মধ্যেই একসাথে মিলে গোটা পৃথিবী জুড়ে (গ্লোবাল) এক 'মহা-ঝড়ের' তান্ডব চালালো। বাস্তবের পৃথিবীতে এরকম কখন-ই না হলেও; মঙ্গলগ্রহে এটা ঘটেই থাকে। একবার তো 'ডাস্ট ডেভিলস্' নামের এক ঘূর্ণিঝড়ের আওতায় পরে, অবেজো 'অপারচুনিটি' রোবটের সৌরপ্যানেলে জমে থাকা পুরোনো ধুলো মুছে যেতেই যানটি আবার চালু হয়ে যায়। আমাদের আবহাওয়ামন্ডলের ঝড়ের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা নাম আছে। 'ডাস্ট ডেভিলস্' সে রকমই একটা। স্ক্রুর মত প্যাঁচালো উত্তপ্ত, ছুটন্ত বায়ুস্তম্ভের নামই ডাস্ট ডেভিল। কারও মতে খুদে টর্নেডো। মরুভূমি বা শুকনো খটখটে, মরুভূমির মতো অঞ্চলেই সচরাচর তাদের দেখা যায়। হঠাৎ যদি কোনো বিশেষ জায়গায় মাটি/বালি গরম হয়ে যায়, তখনই উত্তপ্ত হাওয়া ঝুড়ঝুড়ে (Loose) ধুলোবালি তুলে নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে বেড়ায়, ধুলোর উপস্থিতির জন্যই তা দৃষ্টিগোচর হয়। আর এই 'ডেভিলদের' দেখা যায় সৌরমন্ডলের একমাত্র অন্য গ্রহ ম-ঙ্গ-লে-ই এবং মঙ্গল-ভূমে যখন এদের আবির্ভাব হয়, পরিক্রমন পথে আঁকিবুকি কৃষ্ণ ধূসর দাগ ফেলে যায়। পৃথিবী মরু'তে যদিও তাদের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিট, মঙ্গলে তারা ছোট ছোট টিলা-পাহাড় ডিঙিয়ে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির (রাজস্থানের মরুভূমির মতো) উপর দিয়ে সোজা ছুটতে থাকে। একতলা মাপের বাড়ির আয়তনের ছড়িয়ে থাকা পাথরের চাঁই (বোল্ডারস্) এর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। তারা দীর্ঘস্থায়ী ও দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। উত্তরমেরু সংলগ্ন একটি বালিয়াড়ির ব্যাপ্তি ৫ লক্ষ বর্গ কিমি; যা আমাদের উত্তর আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির সমান। যদিও মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠের মোট ক্ষেত্রফল পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সোভিয়েত রাশিয়ার পাঠানো মার্স-৩ ই প্রথম মহাকাশযান (আগেরগুলো যেমন মার্স'-১ও ২ পৌঁছাতে পারেনি) যা সাফল্যের সঙ্গে ১৯৭১ সালের ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলে পা রাখতে-ই ধুলোঝড়ের ঝাপটায় উল্টে যায় ....। গ্রিক পুরাণের যুদ্ধদেবতার নামে নামাঙ্কিত মার্স বা লাল গ্রহ মঙ্গল তার ('খ্যাতি' বজায় রেখেই) আবহাওয়ার চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনায় পৃথিবীর পাঠানো অতিথি মহাকাশযানগুলোকে কখনও দেখিয়েছে 'হসপিটালিটি' (আতিথ্য) কখনও হোস্টিলিটি (শত্রুতা)। ১৯৭২ সালে মেরিনার - ৯ মহাকাশযানটি (অরবাইটার) মোট যে ৭৩০০ ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল, তার বেশির ভাগই মঙ্গলের ঝড়ের ছবি।

নাসার এক বিজ্ঞানীর মন্তব্য ঃ চরম শুষ্ক অথচ এক অ-পার্থিব, সীমাহীন শীতলতায় ডুবে আছে মঙ্গল (বিষুব অঞ্চলেই মাইনাস ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস! তবে মেরুঅঞ্চলে কত?) কাজেই সুদূর ভবিষ্যতে মানুষ যদি মঙ্গলে বসতি স্থাপন করতেই চায় আবহাওয়ার উষ্ণায়ণ (ওয়ার্মিং) করতে সবরকম গ্রিন হাউস গ্যাস-ই পৃথিবী থেকে রপ্তানী করতে হবে।

মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকুক না থাকুক মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার, সজর্নার, স্পিরিট ও অপারচুনিটি নামক রোভারের (যারা মঙ্গলের বুকে চড়ে বেড়িয়েছে) প্যানরমিক ক্যামেরায় (ওয়াইড ফিল্ড অফ ভিউ) তোলা হাজারো ছবি বিশ্লেষণ করে নাসার জিওলজিষ্টদের কাব্যিক-চোখ খুজে পেয়েছে লক্ষ, কোটি বছরের ঝোড়ো বালির তীক্ষ্ণ আঘাতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে (যে ভাবে মিশরের ২৫০০ বছর পুরোনো স্ফিংস ও রাজাদের চুণাপাথরের মূর্তিগুলো সাহারা মরুর বালির আঘাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে) অনেক পাথর-ই পরিণত হয়েছে ভাস্কর্য-এ (sculpture)। তীব্র এলোমেলো বায়ুপ্রবাহের সাথে তৈরী হয়েছে সুললিত ছন্দের, বিচিত্র নকশা'র স্যান্ড ডিউনস্ বা ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি। নিত্য-ই তাদের ভাঙা গড়ার খেলা। নাসা'র মহাকাশযানগুলো এরকম অসংখ্য ছবি উপহার দিয়েছে পৃথিবীর দর্শক-কে।

মহাশূন্যের মরুদ্যান? মঙ্গল আবহাওয়ার খেয়ালিপনাই যেন শিল্পীর মন – তার ঝড়ের স্বাক্ষরে রয়েছে বিচিত্র তুলির টান। মঙ্গল-ভূমে'র ঐ বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি যেন এক 'প্রাকৃতিক ক্যানভাস'।

সাম্প্রতিক কালে উত্তর মেরুতে অবতরণ করে ফিনিক্স রোবটটি প্রাণের উৎস সন্ধানে ধুলো, বালি ও পাতলা বরফের আস্তরণের কয়েক ইঞ্চি গভীরে তার জটিল যান্ত্রিক হাত দিয়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে তার পোর্টেবল 'ল্যাবরেটোরি'তে বাষ্পীভূত, পৃথক ও চিহ্নিত করে যে রাসায়নিক বিশ্লেষণের তথ্য লক্ষ লক্ষ সিগন্যালের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তা মহাজাগতিক ইতিহাসের এক সূচক ও মানবজাতির পরম সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত।

পৃথিবীর দুপাশের দুই প্রতিবেশির আবহাওয়ামন্ডলের আপেক্ষিকতার আভাস পেতে যদি এমন এক কল্পনালোকে বিচরণ করা যায়ঃ শুক্রগ্রহের কোন 'জীব' পৃথিবীর উষ্ণতম স্থানে এসে বাসা বাঁধল। প্যারিসের সবচেয়ে মূল্যবান গরম পোশাক পরেও 'সে' শীতে কাঁপতে থাকবে। আর মঙ্গলের বিষুব অঞ্চলের কোন জীব পৃথিবীর শীতলতম স্থানে ভ্রমণে আসে তো? শীঘ্রই মানিয়ে নেবে হয়তো বা 'শীততাপ নিয়ন্ত্রিত' বলে ধন্যবাদও জানাবে।

কিন্তু সকলেই তারা শ্বাস কষ্টের 'কমপ্লেন' করবে। তবে ভিন্ন কারণে। উভয় জীব-ই কালবৈশাখী বা কার্তিকের মতো তুমুল ঝড়কে তাচ্ছিল্য করে বলবে "ধু! এতো বেশ বসন্তের হাওয়া"!

"অমেয় আলোর ধারা
পথহারা
আদিম দিগন্ত হ'তে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে
(কেন, নবজাতক) রবীন্দ্রনাথ।

তথ্যসূত্রঃ এই প্রবন্ধটির জন্য নেচার, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ও স্কাই এন্ড টেলিস্কোপ (ইউ. এস. এ) এইসব পত্রিকাগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ (ক) গতবছর পুস্তকমেলার সময় আমার পিতা শ্রী এস সি. পাল প্রয়াত হন। তাই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি উৎসর্গিত হল। 'আমার' অ-বাস্তব জীবন চর্চায় তাঁর সহযোগিতা ও সমর্থন পাথেয়।
(খ) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বন্ধু শ্রী শান্তনু ত্রিবেদী।

জৈব জ্বালানী

রবীন ব্যানার্জি

[খনিজ জ্বালানী শেষ হয়ে আসছে। শুরু হয়েছে বিকল্প জ্বালানীর খোঁজ - বায়ো ফুয়েল বা উদ্ভিদজাত জ্বালানীর সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে। বায়ো ফুয়েল উৎপন্ন হতে পারে অনেক ভেষজ উৎস থেকে - যার অনেকগুলিই আগাছা। কোনও কোনও উদ্ভিদ বেশ বিষাক্ত। সুতরাং বায়ো ফুয়েল উৎপাদনে কোন্ গাছ ব্যবহার করা উচিত, কোনগুলি নয় তাও পর্যালোচনার বিষয়। বর্তমান রচনায় ভারতের বিস্তীর্ণ পতিত ও অকৃষিযোগ্য জমিতে ব্যাপক হারে বায়ো ডিজেল উৎপাদক গাছপালা চাষের সম্ভাবনা ও তার ফলে শক্তি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হিসেবটাও কষেছেন লেখক। ভারতীয় রেলওয়ের রেলপথের দুধারের পড়ে থাকা জমিকে এই কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে রচনাটিতে। যে কোনও নতুন পথে অগ্রসর হবার জন্য যেমন প্রয়োজন থাকে সব দিক ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার বায়ো ফুয়েল উৎপাদনেও তেমনটাই হওয়া উচিত।]

জ্বালানী-সে তেল বা কয়লা যাই হোক না কেন, ভান্ডার সীমিত. আজ না হলেও কাল নিঃশেষিত হবেই হবে। উল্টো দিকে চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। যদিও আজও পৃথিবীর দুশো কোটি মানুষের ঘরে আলো জ্বলে না। প্রতিদিন দুবেলা দুমুঠো রান্না করার জ্বালানিও সংগ্রহ করতে পারে না সবাই। আজও বিশ্বের বহুমানুষ দিনের অর্ধেক সময় ব্যয় করেন রান্নার জ্বালানি সংগ্রহ করতে।

বেশ কিছু দিন ধরেই চলছে বিকল্প জ্বালানির সন্ধান। গত দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় বেশ কিছু রাষ্ট্র জ্বালানি তেলের অভাবে বায়োগ্যাস দিয়ে গাড়িও চালাতে শুরু করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেলের ভান্ডার খুলে গিয়ে, প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল গবেষণা। সে ভান্ডার আজ শেষের দিকে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োফুয়েল নিয়ে চলেছে গবেষণা, আজও চলেছে ছোট বড় ব্যবহার ' ২০০৯ সালেই বিশ্বে বায়োফুয়েলের উৎপাদন/ব্যবহার ১০০ বিলিয়ন-লিটার অতিক্রম করে গেছে, যা প্রায় ১৫ মিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড অয়েলের সমান। এর ফলে পৃথিবীকে ২১৫ মিলিয়ন টন গ্রীন হাউস গ্যাস কম নিতে হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষেও এসব নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম চলছে। সুন্দরবনে বহু বাড়িতেই আজ সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার, সৌর বিদ্যুৎ থেকে ন্যাশনাল গ্রীডেও বিদ্যুৎ পৌঁছে যাচ্ছে। বায়ুশক্তি থেকে বায়ুবিদ্যুৎও ন্যাশনাল গ্রীডে পৌঁছে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে 'ন্যাশনাল বায়োডিজেল মিশন'। মিশনের ২০১০-১১ সালের উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা আছে ১৪.৪ বিলিয়ন লিটার প্রয়োজন আরও বায়োডিজেল উৎপাদন করা। যত বায়োডিজেলের উৎপাদন হবে, ততই কমবে খনিজ তেলের উপর নির্ভরতা।

পতিত (অকৃষি) জমিতে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন করা যাবে এক টন বায়োডিজেল। কর্মসংস্থান হবে এক জন মানুষের।এই বিরাট কর্মযজ্ঞের অংশীদার হতে পারে ভারতীয় রেল। যার নেটওয়ার্ক ৬৪০৬৫ কিমি। স্টেশন, বাজার, রাস্তা, শহর ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে গেছে মোটামুটি ১০-১২ শতাংশ। বাকিটার দুধারে রেলেরই ফাঁকা জমি। কোথাও দুদিকে ২০ মিটার কোথাও বা ২০০ মিটার। মাঝে হয়ত নদীনালা বা পাহাড়ের টানেল। তবুও বিরাট। গড়ে ২০ মিটার ধরলেও তা দাঁড়াবে ১০০০ বর্গকিমির বেশি বা ১১১৮৫৫ হেক্টর (১হেক্টর = ৯১৬৪ বর্গমিটার)। মানে ১১১৮৫৫ টন বায়োডিজেল, ১১১৮৫৫ জন মানুষের কর্মসংস্থান।

Jatropha Curcus জাতীয় গাছের পাতা এক ধরনের রেশম কীটের খাদ্য, তাই *Jatropha Curcus* গাছ লাগালে সেরিকালচারও করা যাবে। ৫০০০০ রেশম কীট থেকে ১টা কাপড় বা ১টা চাদর করা যাবে। গুণগত মান যাইহোক না কেন রেশম কাপড় বা চাদর তৈরী করা যাবে এবং কাজের মাধ্যমে বহুমানুষের কর্মসংস্থানও হবে, এই বিরাট কর্মকান্ডের জন্য যে মানুষগুলো কাজ পাবেন তাদেরকে পাশাপাশি দায়িত্ব দেওয়া যাবে রেল লাইনের ওপর নজরদারির, দেওয়া যেতে পারে প্রহরী বিহীন লেভেল ক্রসিংয়ের। কাজগুলো যদি ছোট ছোট সমবায় সমিতি গড়ে তুলে দেওয়া যায় তবে আশে পাশের গ্রামের মধ্যে যে ছোট খাটো পতিত জমি আছে, সেই জমিতে এই ধরনের গাছ লাগিয়ে বায়োডিজেলের উৎপাদন আরও বাড়ান যেতে পারে। এবং সেই সব মানুষের পতিত জমির উৎপন্ন দ্রব্যও অর্থকরী ফসলে রূপান্তরিত হবে। আরও গাছ বাড়বে। সবুজ পাতা আরও বেশি করে CO_2 গ্রহণ করবে। বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ কমবে।

রেলের ফাঁকা জমি কোথায় কতটা আছে, জমির চরিত্র কি সেটা রেলের দ্বারাই মূল্যায়ণ হতে পারে। কোথায় কোন গাছ লাগান

উচিৎ হবে সেটাও জেলদপ্তর বুঝতে পারবেন। প্রয়োজনে তারা বিশেষজ্ঞর মতামত নিতে পারেন। পৃথিবীতে একশর বেশি প্রজাতির গাছ থেকে তেল পাওয়া যায়। এবং এই গাছ অনুর্বর জমিতেই হয় কিছু গাছের নাম গোত্র দিয়ে একটু পরিচিত হওয়া যাক।

(১) *Jatropha Curcus* (Euphorbiaceae) বাংলা নাম ভেরেন্ডা, সব থেকে বেশি পরিচিতি পেয়েছে বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য। যদিও এর বীজ বিষাক্ত। অনুর্বর খরাপ্রবণ অঞ্চলে জন্মায় ও বাঁচে। প্রতিহেক্টরে ২৫০ টা গাছ লাগালে ১.২ টন বায়োফুয়েল উৎপাদন করা যায়। গাছ লাগানোর ২–৩ বৎসর পর থেকে ফুল, ফল, বীজ পাওয়া যায়। পরাগ মিলন ঘটাতে মৌমাছি পালন করা হলে ফলন বেশি হবে। মধু পাওয়া যাবে। আগেই বলা হয়েছে সেরিকালচারের কথা।

(২) মধ্যভারতের প্রাধানত আদিবাসী অঞ্চলের আর এক অর্থকরি ফসল 'মহুয়া' (*Madhuce Indica*)। সরকারি হিসাবেই এর থেকে ৭০ মিলিয়ন টন বায়োফুয়েল উৎপন্ন করা যায়। এর ফুল মিষ্টি, আখের পরই স্থান। প্রায় ৭৩ শতাংশ চিনি পাওয়া যায়। ১টন শুকনো ফুল থেকে ৪০৫ লিটার বিশুদ্ধ অ্যালকোহল পাওয়া যায়, যদিও এর ফুল থেকেই আদিবাসীরা মদ তৈরী করেন। বীজ থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ বায়োফুয়েল উৎপন্ন হয়। মহুয়া খইল মাছ চাষে ব্যবহার করা হয়। এগাছ বেশ উঁচু হয়, প্রায় ১৮ মিটার। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫৫০ – ১৫০০ মিমি এবং তাপমাত্রা ২-৪৬° সেন্টিগ্রেড হলেও গাছ জন্মায়, ফলও হয়। জুলাই মাসে গাছপ্রতি ১৮ কেজি বীজ পাওয়া যায়।

(৩) প্রাচীন পৃথিবীতে মানুষ ঘরদোর আলো করতে যে সব তেল ব্যবহার করতেন তারই একটা তেল পাওয়া যেত করঞ্জা (Karanja) *Pongamia globra* থেকে। অথচ গাছটার সমস্ত অংশই বিষাক্ত। গা বমি ও ক্ষুধা মন্দা হয়। তবুও হাজার বছর ধরেই এ গাছের তেল মানুষ ব্যবহার করে থাকেন আলো জ্বালাতে গাছটা চির হরিৎ। বালুকাময় পাথুরে যে কোন স্থানে জন্মায়, বেড়ে ওঠে ৪০ ফুট পর্যন্ত। একটা পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে প্রায় ৫০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। বীজে তেলের পরিমাণ গড়ে ২৫ শতাংশ। প্রতি হেক্টর জমিতে ৫৫০ টা গাছ লাগান যায়।

(৪) Sapindacea গোত্রের পর্ণমোচী গাছ, কুসুম, ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। যে কোন পতিত জমিতে জন্মায়। যে কোন গাছ থেকে প্রায় গড়ে ১৫ কেজি শুকনো বীজ পাওয়া যায়। বীজে তেলের পরিমাণ, সর্বোচ্চ ৪০.৩ শতাংশ।

(৫) মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়া গাছ JAJOJA। ১৯৯৪ সালে ভারতে প্রথম রাজস্থানের শিকার জেলার ফতেপুরে ৭০ হেক্টর এবং জয়পুর জেলার ধন্দে ৮০ হেক্টর অনুর্বর পতিত জমিতে লাগান হয়েছিল। বীজ তেলের পরিমাণ ৫০ শতাংশ। আজ ভারতে প্রায় ৫০০ একর অনুর্বর পতিত জমিতে চাষ হচ্ছে।

(৬) MELIACEAE পরিবারের (*Azadirachta India*) নিম পোকামাকড়ের হাত থেকে খাদ্যশস্য, বই খাতা, জামাকাপড় বাঁচাতে যুগযুগ ধরেই মানুষ নিম পাতাকে ব্যবহার করে চলেছে। বৃষ্টিপাত ৭৫০-১০০০ মিমি অঞ্চলে এ গাছ জন্মায়। মানুষ এর পাতা খায়। ডাল দাঁত মাজার কাজে ব্যবহার করা হয়। গাছের বহু ব্যবহার। বিশাল পরিচিতি। মার্চ এপ্রিল মাসে ফুল ফোটে এবং মে-জুন মাসে ফলটা পরিপক্ক হয়। হেক্টর প্রতি ৩৫০ টা গাছ লাগান যেতে পারে। ১০ বৎসর থেকে ফল দেয়। হেক্টর প্রতি ১.৫৮ টন তেল পাওয়া যায়। এছাড়াও বহু গাছ আছে যার মধ্যে রেড়ি বা *Ricinus Communis* এর ব্যবহার আমাদের দেশে আজও প্রচলিত। যার থেকে বায়োফুয়েল তৈরী করা যায় অনেকের নাম গোত্র জানা নেই তাই বলাও গেল না। তবে অনুসন্ধান করলে উদ্ধার করা যাবে। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাবে রেশম শিল্পের, যদিও ভারতে কর্মসংস্থানে কৃষির পরই রেশম শিল্পের স্থান। জেলাদপ্তর যদি এ প্রকল্পের কথা ভাবেন, যদি সমবায়ের মাধ্যমে প্রকল্পটা বাস্তব রূপ নেয়, তবে ভারতে জ্বালানির ভান্ডার চিরদিন ধরে পূর্ণ থাকবে। বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হবে। কোন রকম অনুদান ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সমবায়গুলোর নিজস্ব ভান্ডারও পরিপূর্ণ থাকবে। সব ধরণের তেল বীজের খইল থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা যাবে একই সঙ্গে পাওয়া যাবে জৈব সার। বায়োগ্যাস থেকে জেনেরেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে ফলবে গ্রামের বাড়িতে আলো। তৈল বীজ নিষ্কাশণের মেশিনটাও বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। নিচের সারণীতে আনুমানিক প্রকল্পের খতিয়ান দেওয়া হল (জমি আনুমানিক ১০ হেক্টর, বাৎসরিক) ঃ-

		মহুয়া	করঞ্জ	কুসুম	নিম	হিঙ্গান
১.১	গাছের সংখ্যা	২০০০	১৩০	৩২৪	২২১	২০০
১.২	তৈলবীজের পরিমাণ (টন)	৩৬	৬ ৫	১৬.২	৭.৭৫	৪ ২৫
১.৩	সংগ্রহের খরচ (টন)	৬,০০০	৪,০০০	৩,০০০	৩,০০০	২,৫০০
১.৪	উৎপন্ন তেলের পরিমাণ (টন)	১৩.৮	১.৬১	৭.২৯	০.৯২	১.৭
১.৫	উৎপন্ন খইলের পরিমাণ (টন)	২২	৪.৫	৮	৬.২	২.৩
১.৬	মোট কর্মদিবস	১৭১	৩০	৭৫	৩৫	২০
১.৭	দৈনিক মজুরী টাকা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
১.৮	নিষ্কাষণ যন্ত্র চালানোর	—	—	৩	—	—
	জন্য যত তেল ব্যবহার হবে	—	—	—	—	—
১ ৯	বিক্রয়যোগ্য তেলের পরিমাণ (টন)	১৩ ৮	১ ৬২	৪.২৯	০ ৯২	১.৭
১.১০	প্রতিটন তেলের বিক্রয়মূল্য	২৪,০০০	২৪,০০০	১৫,০০০	২৫,০০০	১৫,০০০
১.১১	প্রতিটন খইলের বিক্রয়মূল্য	৪,৫০০	৪,৫০০	২,৫০০	৪,৫০০	৩,০০০
১.১২	তৈলবীজের ক্রয়মূল্য	২,১৬,০০০	২৬,০০০	৪৮,৬০০	২৩,২৫০	১০.৬২৫
১.১৩	মজুরী বাবদ খরচ	১,৭১,০০০	৩,০০০	৭,৫০০	৩,৫০০	২,০০০
১.১৪	তেলের বিক্রয় মূল্য	৩.৩১,২০০	৩৮,৮৮০	৬৪,৩৫০	২৩,০০০	২৫,৫০০
১.১৬	ব্যয়	২,৩৩,১০০	২৯,০০০	৫৬,১০০	২৬,৭৫০	১২.৬২৫
১.১৭	আয়	৪,৩০,২০০	৩৯,১৩০	৮৪,৩৫০	৫০,৯০০	৩২,৪০০
১.১৮	উদ্বৃত্ত	১,৯৭,১০০	৩০,১৩০	২৮,২৫০	২৪,২৫০	১৯,৭৭৫
১ ১৯	জেনেরটর পরিচর্যা	প্রতি ৫০০ ঘন্টায়, মোট ৮ বার ৮০০/- প্রতিবারে৩,২০০				
১.২০	নিষ্কাষণযন্ত্র পরিচর্যা					৩,০০০
	নিট আয়	২,৯৯,৪০৫	৬,২০০	২৯৩,২০৫ টাকা		

এই ধরণের একটা ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এইরূপ :-

১।	একটি টিনের বা টালির বড় ঘর	১,০০,০০০/-
২।	ঘন্টায় ৪০ কেজি তেল নিষ্কাষণের ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্র, মোটর সহ	১,২৫,০০০/-
৩।	বায়োগ্যাস চালিত জেনেরেটর	১,০০,০০০/-
৪।	তেল নিষ্কাষণ যন্ত্র, জেনেরেটর বসানোর খরচ ও বৈদ্যুতিক লাইন	২৫,০০০/-
৫।	১ মাস কারখানা চালানোর খরচ	৪৬,৭০০/-
৬।	বিবিধ খরচ	৪৫,০০০/-
	মোট খরচ	৪,৪১,৭০০/-

বাৎসরিক উদ্বৃত্ত ২,৯৩,২০৫/-

ঋণ ফেরৎ দেওয়া যাবে, ১৮ মাসে।

বায়োগ্যাস চালিত জেনারেটর দিয়ে অঞ্চলের রাস্তাঘাট আলোকিত করা যেতে পারে। আশেপাশের মানুষদের বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যুৎ দিয়ে আটাকল / ধানভাঙার কল চালানো যেতে পারে। একই সঙ্গে পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার, চাষের কাজে লাগতে পারে। বিদ্যুৎ, জৈব সার বিক্রি করে পাওয়া যেতে পারে কিছু টাকা। উপরোক্ত হিসাব কয়েক হেক্টর জমির ওপর একটা ছোট সমবায়ের ভাবনা মাত্র। বলদপুর চাইলে ভাবতে এরকম অনেক জায়গায় সমবায় করে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন। তৈরী করাতে পারেন প্রচুর বায়োডিজেল। নিচের সারণিতে মহুয়া থেকে উৎপাদিত ১০০ কেজি বায়োডিজেলের উৎপাদন খরচ হিসাব দেওয়া হল।

ধরা যাক বীজ থেকে ৩৭ শতাংশ তেল পাওয়া যায় এবং তেল থেকে ৯০ শতাংশ বায়োডিজেল পাওয়া যাবে।

বীজের সংগ্রহ মূল্য, ৬ টাকা কেজি, ৩০০ কেজি	১,৮০০/-
মজুর খরচ, ৩ টাকা কেজি, ৩০০ কেজি	৯০০/-
সালফিউরিক এ্যাসিড, মেথানল এবং কস্টিক সোডার দাম	১,৬৯০/
পরিচালনার খরচ	২০০/-
মোট খরচ	৪,৫৯০/-
মহুয়া খইল বিক্রয় বাবদ আয় ৪.৫০ কেজি প্রায় ১৮০ কেজি	৮১০/-
গ্লিসারিনের বিক্রয় বাবদ আয় (১ কেজি)	২৫/-
খইল ও গ্লিসারিনের আয় বাদে ১০০ লিটার থেকে উৎপন্ন বায়োডিজেলের উৎপাদন খরচ	৩,৭৫৫/-

তথ্যসূত্র :

1. Case Study of a Tribal Village in Melghat, Energy Independence through locally available bio-fuels by Dr. S. V. Deshpande, Dept of Mechanical Engineering, Visweswaraya National Institute of Technology, Nagpur and S. W. [illegible] Dept of Mechanical Engineering, PRM Institute of Technology & Research, Amaraboti
2. Agricultural Statistics at a Glance, 2008.
3. World Energy Outlook, 2006 & 2007
4. Indian Petroleum Statistics, Ministry of Petroleum, Govt. of India, 2008
5. Hingan Balanites oil as fuel for compression ignition engines. Biomass and Bioenergy 09. 13(1)
6. A compilation of Plantation Programme of TBOs undertaken during 10th Planing (02-07) Feb 09 by National Oil seeds and vegetable Oil Development Board.

বিশ্ব উষ্ণায়ন

[গ্লোবাল ওয়ার্নিং --- চন্দন সুরভি দাস, কোলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, 2009, মূল্য : 100টাকা, পৃঃ 64 (প্রাপ্তিস্থান—বুকমার্ক 6 বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কল-73)]

অধ্যাপক চন্দন সুরভি দাস লিখিত বই গ্লোবাল ওয়ার্নি তথ্যের সম্ভারে সমৃদ্ধ। বিশ্ব উষ্ণায়নে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনে প্রকৃতি ও সভ্যতা ধ্বংসের যে চারাগাছ বিকশিত হচ্ছে তার কথা মনে রেখে লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে বইটির নামকরণ করেছেন 'গ্লোবাল ওয়ার্নিং', 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'য়ের বদলে। লেখক খুব সংগতভাবেই বলেছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর তাৎপর্য শুধুমাত্র পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নেই, তা খরা, বন্যা, ঝড়ের তীব্রতা ও সংখ্যা-বৃদ্ধি, পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি, জীব বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ও অবলুপ্তি, ভূপৃষ্ঠের নিম্নাংশ ও সমুদ্র উপকূলের নিমজ্জন, ক্রান্তীয় অঞ্চলে নিত্য নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি সমস্যায় পরিব্যাপ্ত।

সমগ্র বইটি জুড়ে এইসব বিষয়-গভীর বৃত্তান্ত পেরিয়ে দুয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ না করে পারছি না। সাতের পৃষ্ঠার শেষাংশে সূর্য কিরণ বায়ুমন্ডলে আংশিক শোষণের পর ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে যে তাপীয় ভারসাম্য তৈরী করার বিবরণ দেওয়া আছে তা বেশ কিছুটা ভুল ভ্রান্তিতে ভরা, বস্তুতঃ, সূর্য থেকে আগত বিকিরণের বেশির ভাগটাই ক্ষুদ্র ও দৃশ্যমান তরঙ্গের কিরণে ভরা এবং বায়ুমন্ডল এদের সাপেক্ষে খবই স্বচ্ছ। এই সূর্য বিকিরণ ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছে শোষিত ও পুনর্বিকিরিত হয়। ঐ বিকিরিত আলোর প্রকৃত অংশ অবলোহিত তরঙ্গে ভরা থাকে যা বাতাসের গ্রিন হাউস গ্যাস (যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড় ইত্যাদি) কর্তৃক শোষিত হয়, আবার বিকিরিত হয়। এই শোষণ-বিকিরণের প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অঞ্চলকে উষ্ণ করে এক তাপীয় ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি করে যা গ্রিন হাউস এফেক্ট নামে পরিচিত। বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা দাঁড়াত—18°C;এদের উপস্থিতিতে উষ্ণতা বেড়ে হয়েছে 14°C। 1906 - 2005 একশ বছরে জীবাশ্ম জ্বালানি দহনে মনুষ্য সৃষ্ট মূল গ্রিঃ হাঃ গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ বাতাসে বেড়ে যায় 280 থেকে 385 পিপি এমে ও ভূ-উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটে 0.74°C। তবে এক বিচিত্র ব্যাপার 1946 থেকে 1977 অবধি ভূ-উষ্ণতা সামান্য কমেও যায় (~0.15°C)। এই সময় প্রচুর তুষারপাত হয় এবং উত্তর গোলার্দ্ধের হিমবাহগুলি বৃদ্ধি পেয়ে এগোতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ, গ্রিন হাউস গ্যাসকে বইটির বিভিন্ন স্থানে আক্ষরিক অর্থে 'সবুজ ঘরের গ্যাস' বলে বর্ণনা করা খুবই বিভ্রান্তিকর যা এর সংজ্ঞা ও গ্রিঃ হাঃ প্রভাবের ধারণার সঙ্গে মানানসই নয়। 1975 সাল থেকে গত তিন দশকে পৃথিবীতে আরও অনেক শহর গড়ে তোলার ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দশকে 0.2°C হারে ভূ-উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আই-পি-সি-সির বিভিন্ন প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়েছে এই হারে গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়লে শতাব্দী শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা 1.1°C থেকে 6.4°C অবধি বেড়ে যেতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়নে তীব্রতম গ্রীষ্মের পর আমেরিকা, ইউরোপ, থাইল্যান্ডের মত দেশে এসেছে শীতলতম সকাল। জাপান, কোরিয়ায় তীব্রতম তুষার ঝড় হয়েছে। কুমেরু সুমেরুর সুবিশাল বরফের চাদর গলতে সময় লাগলেও হিমবাহ সব দ্রুত হারে গলতে শুরু করেছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ এখন 25 মিটারের বদলে 30 মিটার হারে কমছে। তাই লেখকের আশঙ্কা এইভাবে চললে 2035 সালের মধ্যে হিমালয় বরফশূন্য হয়ে পড়বে। তবে আমরা জানি, বর্তমানে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গঙ্গোত্রী হিমবাহের হ্রাস অনেক কমে বছরে 6 মিটারে দাঁড়িয়েছে। এই হারে গঙ্গোত্রী সম্পূর্ণ গলে যেতে 1500 বছর সময় লেগে যাবে। সব হিমবাহ শুকিয়ে গেলে পৃথিবীর সব নদ নদীও শুকিয়ে যাবে। অবশ্য উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বরফ গলনের কারণে 1993 সালের পর থেকে সমুদ্র তলের উচ্চতা প্রায় দ্বিগুণ হারে বেড়ে চলেছে (বছরে 3.1mm)।

উত্তর গোলার্দ্ধে গত 100 বছরে উষ্ণায়নে মেঘের আবরণ বেড়েছে 2%, এর সঙ্গে গত 30/40 বছরে গড় বৃষ্টিপাতের হার বেড়েছে। উষ্ণায়নের প্রভাবে পৃথিবীর নতুন নতুন অঞ্চলে খরার করাল গ্রাস, বন্যার প্রকোপ এবং ঝড় ঝঞ্ঝা বৃদ্ধি পাবে, এরকম অজস্র তথ্য ও ঘনীয়মান সংকটের ভবিষ্যদ্বাণীতে ভরা গ্লোবাল ওয়ার্নিং।

বিশ্ব উষ্ণায়নে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলির আনুপাতিক অবদান হল : CO_2 - 75%, মিথেন - 13%, নাইট্রাস অক্সাইড় - 6%।

1997 সালে জাপানের কিয়োটো শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী ও ইচ্ছুক দেশগুলিকে কিয়োটো প্রোটোকল নামে এক পরিবেশ চুক্তির আইনি বাধ্যবাধকতায় বাঁধার চেষ্টা করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলিকে 2008 থেকে 2012 সালের মধ্যে 1990 সালে বাতাসে নিঃসৃত CO_2 গ্যাসের পরিমাণের তুলনায় গড়ে 5.2% নিঃসরণ হ্রাস করতে হবে। এই চুক্তি প্রায় সমস্ত উন্নত দেশ অনুমোদন করলেও আমেরিকা চুক্তিটিতে সই করে পরে অনুমোদন করে নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইংলন্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি সহ ছটি দেশ চুক্তিটি মেনে চললেও আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তুরস্ক, স্পেন, পর্তুগালের মত অধিকাংশ উন্নত দেশ ব্যাপকভাবে এই চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। আমরা দেখেছি, 2009-এর ডিসেম্বরে ও 2010-এর ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন ও কানকুন জলবায়ু সম্মেলনে এই দেশগুলি কিয়োটো প্রোটোকল মান্য করতে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নেয় নি।

লেখক কার্বন-বাণিজ্যের রূপরেখা মোটামুটি ভালোভাবেই এঁকেছেন। কোনো শিল্প সংস্থা তার জন্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার কম গ্যাস নিঃসরণ করলে বাকি অংশ নিঃসরণের অধিকার দেশের বা বাইরের সংস্থাকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রী করতে পারে (কার্বন অধিকার)। কোনো শিল্পোন্নত দেশ তার নিঃসরণ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার জন্যে কোনো বিকাশ-শীল দেশ থেকে কার্বন অধিকার কিনতে পারে বা তার বদলে বিকাশশীল দেশে কোনো প্রকল্প যেমন পুনর্নবীকরণ-যোগ্য শক্তি-প্রকল্প চালু করে দিতে পারে। তবে সেই প্রকল্পকে বলা হয় পরিচ্ছন্ন বিকাশ কৌশল বা **Clean Development Mecanism**, সংক্ষেপে সি-ডি-এম। আমাদের দেশে সারা বিশ্বে অনুমোদিত বা অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা মোট সি-ডি-এমের 33% আছে। এই প্রকল্পগুলি বাতাসে কার্বন কমিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নকে কমাবে তা স্রেফ ধাপ্পা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়।

'বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন', 'জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিহাস', 'বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের সময় পঞ্জিকা' পরিচ্ছেদগুলি খুবই মূল্যবান সংযোজন। এগুলি বিশ্ব উষ্ণায়ন বুঝতে পাঠকের বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপট তৈরী করে নিতে খুবই সহায়ক। এক আধটা গুরুতর ত্রুটির কথা বাদ দিলে উষ্ণায়ন নিয়ে রাজনীতি ও বিতর্কের আলোচনা তথ্যপূর্ণ। এই বিষয়ে বাংলায় লেখা আরও কয়েকটি চালু বই অপেক্ষা এই বইটি বেশিমাত্রায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা। আপনি উষ্ণায়নের গ্রিন হাউস তত্ত্ব বা অন্য কোন তত্ত্ব, তাদের সমন্বিত মত অর্থাৎ যে কোনো মতের পথিক হোন না কেন এই বই পড়ে অনেক রসদ আহরণ করতে পারবেন। তবে পরবর্তী সংস্করণে লেখককে ভাষা সম্পর্কে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে' কেননা কোনো কোনো জায়গাতে ভাষার স্বচ্ছতা যেন হারিয়ে গিয়েছে। দুয়েকটি ব্যতিক্রমী জায়গায় আলগা ভাষা সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের অবতারণা করেছে (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা 14, লাইন 19 - 20)। পরিশেষে, বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলনের সহায়ক এই বইয়ে সুদৃশ্য রঙিন ছবির প্লেটগুলি খুবই আকর্ষণীয়।

কুমারেশ মিত্র

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে কিশোর-মনস্তত্ত্ব

ঈশিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"জগৎ পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা" - মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কৈশোরকালকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'ঝড়ঝঞ্ঝা' বা 'পীড়ন এবং কষ্টের কাল' বলা হয়ে থাকে। মানবজীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে কৈশোরকালীন স্তর অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির ইংরাজী প্রতিশব্দ Adolescence মানে growing up বা বৃদ্ধি পাওয়া। সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০-১২ বছর থেকে ১৮-২০ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২-১৩ বছর থেকে ১৮-২০ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোরকাল বিস্তৃত। এই সময় ছেলেমেয়েদের শৈশব চলে যায় এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একজন ছেলে বা মেয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠার দিকে যাত্রা করে। একদিকে পিছন পানের ডাক আর অপরদিকে আগামীর স্বপ্নে তার ব্যক্তিমন হয় দ্বিধান্বিত —

> "স্তম্ভিত চিৎকার সে যেন, যন্ত্রণা নির্বাক,
> যে যুগ গেছে তার উদ্দেশে কণ্ঠ হারার ডাক।"

আবার,

> "আজকে যে ওর অন্ধ নয়ন, কাতর হয়ে চায়
> সম্মুখে কোন নিষ্ঠুর শূণ্যতায়।"

সমগ্র বিশ্বের কৈশোরকালকে নিয়ে রচিত সাহিত্য কিশোরের নিভৃত রহস্যময় মনোলোকের দ্বারে আলো জ্বালিতে সাহায্য করেছে, আর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ছোটগল্পের কিশোর চরিত্রগুলি মনোলোকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করছেন তখন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি পরিচিত হয়েছেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ মাথায় রেখে তিনি তাঁর কিশোর চরিত্রগুলি নির্মান না করলেও গল্পগুলিতে কিশোর মনের রুদ্ধ পথের পাষাণ ঠেলে নির্ঝরিনীস্রোত গতি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', 'অতিথি', 'আপদ', 'বলাই', 'সুভা', 'সমাপ্তি' ইত্যাদি ছোটগল্পে কিশোর মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা মেলা সম্ভব। কিশোর বালিকার আবেগানুভূতি, তাদের স্বপ্নকল্পনা, হাসিকান্না, সুখ দুঃখের কথা, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, প্রেমানুভূতি বড়দের কাছে অতিতুচ্ছ, বাস্তবে সেগুলির কোন গুরুত্ব নেই। পৃথিবীর পথে যাত্রা শুরুর এই শুভলগ্নে তারা যেন এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই। থাকেনা তাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। শরীরের গঠন বিন্যাসে তারা না থাকে শিশুর দলে, আবার পরিপূর্ণতার সীমাও দূরবর্তী। 'আপদ' গল্পে নীলকান্তের চেহারার বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যদি চোদ্দ পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই হয় সে অকালপক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।" 'ছুটি' গল্পে কিশোর ফটিকের বাহ্য চেহারার বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি "বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগেনা। স্নেহও উদ্রেক করেনা, তাহার সঙ্গসুখ ও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা।" 'বলাই' গল্পে দেখি কিশোর বলাইয়ের প্রতিরূপ শিমুল গাছ যেখানে সেখানে বড় হয়ে ওঠায় বলাইয়ের কাকার বিরক্তির কারণ হয়েছে। শুধু বাহ্য চেহারাই নয়, ঘুমন্ত পুষ্পের পাঁপড়ি উন্মোচনের মতো কৈশোরের মনোভিলাষ ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ - 'সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না, এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা জন্মায়। এই সময় যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে।"

সমাজের দরদভরা ভালোবাসা না পেলেও লেখকের অকৃপণ স্নেহবাৎসল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি রতন, সুভা, বলাই, নীলকান্ত বা ফটিকের দল। অতি যত্নে, পরম মমত্বে তাদের হৃদয় রহস্যকে ভাষা দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'ছুটি' বা 'আপদ' - দুই গল্পেই দেখি "জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসায়" য় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ফটিক বা নীলকান্ত। তাদের ভালোবাসা ভাষা পায়না, শুধু একপ্রকার বিষণ্ন ব্যথা জাগিয়ে তোলে। কৈশোরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশের চাহিদা। সেই চাহিদা থেকেই বন্ধনভীরু হরিণশিশুর মতোই তারাপদ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বপ্রবাহের আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গে। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার আগ্রহে কিশোর মন স্বভাবতই উৎসুক হয়ে থাকে। তারাপদর বোহেময়ানিজম্‌ তারই ইঙ্গিতবাহী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দুরন্ত আশা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঘরের বদ্ধ কোণ ছেড়ে সমগ্র বিশ্বে একাত্ম হতে

চেয়েছিলেন - "ইহার চেয়ে হোতেম যদি আরব বেদুইন / চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"
বলাই, সুভা, মৃন্ময়ী প্রত্যেকেই বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতিমাতার কোল থেকেই খুঁজে পেয়েছিল প্রাণের রসদ। জননীতুল্য পল্লীপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতার সূত্রেই অকালে প্রাণ হারাতে হয়েছিল ফটিককে। মূক ধরনীর মূক সন্তানেদের প্রতি ভাষাহীন সুভার প্রণয় এবং অরণ্য ও বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্যমুগ্ধ বলাইয়ের আত্মীয়তা আর পাঁচজন কিশোর কিশোরী থেকে তাদের বিশেষভাবে পৃথক করেছিল

পোষ্টমাস্টার 'গল্পে দেখি কিশোরী রতনের জীবনে নারীত্বের বার্তাবাহী পোস্টমাস্টারের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তার অদম্য হৃদয়াবেগ। জগতের ক্রোড়বিচ্যুত 'অনাথিনী' রতন তার 'দাদাবাবু'র অভিভাবকত্বে শহরে গিয়ে বাস করতে চায়, কিন্তু তা যে কেন অসম্ভব ও অবাস্তব সেটা তার কিশোরীমন ভেবে পায়না, সামাজিক বিধানের কাছে তার কিশোরীমনকে পরাভূত হতে হয়। অপর দিকে সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষাকারী মৃন্ময়ীকেও নানাভাবে শিকল পড়াতে চেয়েছিল তার সমাজ, কিন্তু তাতে তার কিশোরী সত্তার উদ্দামতা পরাভূত হয়নি। তবে স্বামী অপূর্বর ভালোবাসায় তার জীবনের তৃতীয় পর্বের সূচনা হল। রতনের জীবনে যা অসমাপ্ত থেকে গেল, তা মৃন্ময়ীর জীবনে সোনার কাঠির অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হল —

"মা ধরনীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন পাশ
জ্যোতিষ্কদের উর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।"

'দালিয়া' গল্পে আমিনা ও দালিয়া প্রকৃতির উন্মুক্ত বিচরণক্ষেত্র থেকেই জীবনের আদর্শ পাঠ পেয়েছিল - হিংসা নয়, ক্ষমা ও ভালোবাসার দ্বারাই সুন্দর করে তোলা যায় জীবন ও জগতকে। কিশোরমন স্বভাবতই গঠনমূলক। যুক্তির থেকে আবেগের প্রাধান্য যেখানে বেশী সেখানে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চায়।

তবে সকল কিশোর-কিশোরীর জীবনেই ভালোবাসা শুভ পরিণতি নিয়ে আসেনা। হৈমন্তী গল্পে কিশোরী বধূকে নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছিল। যে কিশোরী তার মুক্ত, স্বাধীন দৃষ্টি দিয়ে, তার স্বচ্ছ, সুন্দর বোধ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে চিনে নিতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সমাজের সংকীর্ণ বিধানের কাছে থেমে গিয়েছিল তার পথচলা। 'সুভা' গল্পের নায়িকা সুভা শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হলেও তার মত সুকোমল, সংবেদনশীল মনের অধিকারী কোন সুস্থ মানুষও ছিলনা। তাই প্রতাপের কাছে সুভা 'সু' তে উত্তীর্ণ হওয়ায় সুভার মনের প্রত্যাশাও বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার অব্যক্ত হৃদয়ের ভাষা বোঝার ক্ষমতা সুভ সদৃশ প্রতাপেরও ছিল না, ছিলনা সুভার বাবা-মায়েরও, অনুরূপভাবে 'মাল্যদান' গল্পে ও দেখি, ষোড়শী কিশোরী কুড়ানিকে যতীন নিজের যোগ্য মনে করতে পারেনি। সে তার ডাক্তারী অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল কিন্তু কুড়ানির মনেও যে রঙীন স্বপ্ন বাসা বাঁধতে পারে সে বিষয়ে যতীনের উদাসীনতা কুড়ানিকে বারবার আহত করেছে। সে রসিকতা বোঝেনা। বয়সোচিত ধর্মে সে যতীনকে নিজের স্বামী হিসেবেই গ্রহণ করেছে, আবার এই সত্যকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেও হয়েছে কুণ্ঠিত। 'একরাত্রি' গল্পে ১৫-১৮ বছর বয়সী নায়ক তথা কথক চরিত্র উদ্দাম আবেগে দেশসেবার কাজে মনোনিবেশ করেছে, বিবাহের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে নিজের জীবনের গতিকে সীমায়িত করতে চায়নি, কারণ আঠারো বছর বয়স- "সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।' কাহিনীর অগ্রগতির অদম্য আকর্ষণ ও কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে। কিশোর মনের অদম্য বাসনার ছায়াপাত ঘটেছে চরিত্রটিতে। 'কঙ্কাল' গল্পে কিশোরী মেয়েটির নিজের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে রূপজ মোহ, যাকে 'আত্মরতি' নাম দেওয়া যেতে পারে।

'নষ্টনীড়' গল্পে বালিকাবধূ চারুলতা যৌবনে প্রবেশ করলেও তার মনের কোণে কৈশোরের রেশ থেকে গিয়েছিল, যার প্রভাবে সে তার দেওর অমলের প্রশংসা কুড়োতে চেয়েছিল নিজের লেখনীর পারদর্শিতার মাধ্যমে। ভ্রাতৃজায়া মন্দাকিনীর প্রতি ঈর্ষামূলক মনোভাবকে সে চাপা রাখতে পারেনি, অমলের প্রতি অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হয়েছে বিক্ষত। গল্পকার অপরূপ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন চারুলতার হৃদয়রহস্য।

মনোবিদ ফ্রয়েড কথিত এই 'ঝড়ঝঞ্ঝা' বা 'পীড়ন ও কষ্টের' কালে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে অনেক দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় কিশোর-কিশোরীদের। বয়ঃসন্ধিক্ষণে পরিচিত পরিবেশ ও পরিচিত সম্পর্কগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিশোর-কিশোরীদের প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশার মুখোমুখি হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির অনেকক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলি উঠে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ খ্রীঃ 'চোখের বালি' উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম মানুষের 'আঁতের কথা' কে তুলে ধরেছেন। কিন্তু আলোচ্য ছোট গল্পগুলিতে যে অপূর্ব কুশলতায় তিনি কিশোর মানস চিত্রিত করেছেন, আধুনিক বিশ্লেষণের দ্বারা যেসকল কিশোর-কিশোরীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অনেকক্ষেত্রেই সে সকল কিশোরের দল সমাজ ও বড়দের কাছে নানাভাবে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত হয়েছে, তবে পাঠকহৃদয়ের স্বর্ণসিংহাসনে তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্ক্যামেকোরি

ভারতে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে চলা আর্থিক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি দর্শনিক আলোড়িত করেছে। মিডিয়ার প্রচারে বলিউড স্টার বা ক্রিকেট স্টারদের থেকেও এগিয়ে আছেন স্ক্যাম স্টাররা। এক এক জন মহা নক্ষত্র ব্ল্যাক হোলের মত যা পেয়েছে গ্রাস করতে দ্বিধা করে নি কেউ। যাঁরা মিডিয়ার ফোলানোপের কুম্ভীপাকে জড়িয়েছে তাবড় রাজনীতি, ব্যবসা, শিল্প, মিডিয়া জগতের মহানায়কদের নাম। ১৯৯৬-এর লালু প্রসাদ অ্যান্ড কোং কৃত বিহারের পশুখাদ্য ঘোটালাকে নাকি ঘোল খাইয়ে দিতে পারে টেলিকম, কমনওয়েলথ বা মাইনিং স্ক্যাম। যেন প্রতিযোগিতা হচ্ছে - কে কত লুটবি আয়। ধন্য, দেশের দুর্নীতি দমন আইন আর নজরদারি ব্যবস্থা। যদি বাংলা জানা থাকতো তাহলে ভক্তি গদগদ চিত্তে স্ক্যাম স্টাররা নিশ্চয় গাইতো - "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"। যা হোক, এরমধ্যে একটা ই-মেল পাওয়া গেল বন্ধু সূত্রে। তিনিও পেয়েছেন তস্য তস্য বন্ধু বা পরিচিত জন সূত্রে। ই-মেলে দেওয়া হয়েছে ১৯৯২ থেকে ঘটে যাওয়া আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ। ধরেই নিচ্ছি মিডিয়া সূত্রে এই টাকার পরিমাণ আহরণ করা। এবং হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত অথবা সঠিক পরিমাণ আরও বেশি। তবু 'জেনারেল নলেজ' হিসেবে আমাদের, বিশেষত নবীন প্রজন্মের কাজে লাগতে পারে ভেবে হিসাবটা পরিবেশন করছি।

১৯৯২ সাল থেকে ভারত রাষ্ট্রের ভেতরে ঘটে যাওয়া আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ঃ ৭৩,০০,০০,০০,০০,০০,০০ টাকা (৭৩ লক্ষ কোটি টাকা) বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? আসুন হিসাব টা মিলিয়ে নিই ঃ-

১৯৯২		হর্ষদ মেহতার সিকিউরিটি স্ক্যাম	=	৫,০০০	কোটি টাকা
১৯৯৪	-	চিনি আমদানি কেলেঙ্কারি	=	৬৫০	কোটি টাকা
১৯৯৫	ক)	প্রেফারেনশিয়াল অ্যালটমেন্ট স্ক্যাম	=	৫,০০০	কোটি টাকা
	খ)	যুগস্লাভিয়া ডিনার স্ক্যাম	=	৪০০	কোটি টাকা
	গ)	মেঘালয় বন কেলেঙ্কারি	=	৩০০	কোটি টাকা
১৯৯৬	ক)	সার আমদানি কেলেঙ্কারি	=	১,৩০০	কোটি টাকা
	খ)	ইউরিয়া স্ক্যাম	=	১৩৩	কোটি টাকা
	গ)	বিহার পশুখাদ্য ঘোটালা	=	৯৫০	কোটি টাকা
১৯৯৭	ক)	সুখরাম টেলিকম স্ক্যাম	=	১,৫০০	কোটি টাকা
	খ)	SNC লাভলীন প্রোজেক্ট স্ক্যাম	=	৩৭৪	কোটি টাকা
	গ)	বিহার জমি কেলেঙ্কারি	=	৪০০	কোটি টাকা
	ঘ)	সি আর বনশালী শেয়ার দুর্নীতি	=	১,২০০	কোটি টাকা
১৯৯৮	-	শাল চারা বপন দুর্নীতি	=	৮,০০০	কোটি টাকা
২০০১	ক)	UTI স্ক্যাম	=	৪,৮০০	কোটি টাকা
	খ)	দীনেশ ডালমিয়া শেয়ার দুর্নীতি	=	৫৯৫	কোটি টাকা
	গ)	কেতন পারেখ সিকিউরিটি স্ক্যাম	=	১,২৫০	কোটি টাকা
২০০২	-	সঞ্জয় আগরওয়াল হোম ট্রেড স্ক্যাম	=	৬০০	কোটি টাকা
২০০৩	-	তেলগি স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারি	=	১৭২	কোটি টাকা
২০০৫	ক)	IPO ডিমাট স্ক্যাম	=	১৪৬	কোটি টাকা
	খ)	বিহার বন্যা ত্রাণ দুর্নীতি	=	১৭	কোটি টাকা
	গ)	স্কর্পিও সাবমেরিন দুর্নীতি	=	১৮,৯৭৮	কোটি টাকা
২০০৬	ক)	পাঞ্জাব সিটি সেন্টার প্রজেক্ট স্ক্যাম	=	১,৫০০	কোটি টাকা

	খ)	তাজ করিডোর দুর্নীতি	=	১৭৫	কোটি টাকা
২০০৮	ক)	পুনের ধনকুবের হাসান আলির ট্যাক্স ফাঁকি	=	৫০,০০০	কোটি টাকা
	খ)	সত্যম স্ক্যাম	=	১০,০০০	কোটি টাকা
	গ)	সেনাবাহিনীর রেশন চুরি দুর্নীতি	=	৫,০০০	কোটি টাকা
	ঘ)	স্পেকট্রাম দুর্নীতি	=	৬০,০০০	কোটি টাকা
				(CAGর হিসেব ১,৭৬,০০০ কোটি টাকা)	
	ঙ)	স্টেট ব্যাঙ্ক অফ সৌরাষ্ট্র দুর্নীতি	=	৯৫	কোটি টাকা
২০০৯	ক)	ঝাড়খণ্ডের মেডিকাল সরঞ্জাম ক্রয় দুর্নীতি	=	১৩০	কোটি টাকা
	খ)	চাল রপ্তানী দুর্নীতি	=	২,৫০০	কোটি টাকা
	গ)	ওড়িশার খনি দুর্নীতি	=	৭,০০০	কোটি টাকা
				(মতান্তরে ১৪,০০০ কোটি টাকা)	
	ঘ)	মধু কোড়া খনি দুর্নীতি	=	৪,০০০	কোটি টাকা

হয়ত অন্য অনেক মহা স্টারদের নাম বা তাদের তাক লাগানো কাজকর্মের উল্লেখ বাদ থেকে গেল, বাদ থেকে গেল ২০১০-এর কমনওয়েলথ স্ক্যাম এবং টেলিকম স্ক্যামের হিসাবও - এজন্য আন্তরিক দুঃখিত। তবে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক আলু কেলেঙ্কারির মত 'ছোট খাটো' ব্যাপার ধরার চেষ্টাও করা হয়নি। কারণ মাননীয় মন্ত্রী মোর্তাজা হোসেন মশাই নাকি বলেছেন "ওসব ৩২-৪০ কোটি টাকার দুর্নীতি কোনও ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না"। তাঁর উপদেশ মেনে নিয়েই এই হিসেব লেখা হল। -শি.নি.

হরি শর্মা প্রয়াত :

২০১০ সালে ১৬ মার্চ হরি প্রকাশ শর্মা বৃটিশ কলাম্বিয়াতে প্রয়াত হলেন। উত্তর প্রদেশের দাদরিতে যে দুরন্ত প্রাণটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৪-এর নভেম্বর মাসের এক হাড়কাঁপানো শীতে, ৭৬ টি দুর্দান্ত ঘটনাবহুল বসন্ত অতিক্রম করে সেই অশান্ত প্রাণটির জীবনদীপ নির্বাপিত হলো। প্রশ্ন উঠতেই পারে, ভারতের মতো এত বিপুল জনসংখ্যার দেশ থেকে যে জনস্রোত প্রবাসে নীড়ের সন্ধানে পাড়ি জমান, তাঁদের মধ্যে থেকে আলাদা করে হরি শর্মাকে (ইনি এই নামেই ভারতের আন্দোলনরত মানুষদের কাছে বেশি পরিচিত ছিলেন) বেছে নেওয়ার নেপথ্য কারণগুলো বর্ণনা করা যেতে পারে।

হরি শর্মা আগ্রা এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পাশ করে মার্কিন দেশের নামী কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ব বিষয়ে পি এইচ ডি লাভ করেন। ষাটের দশকে সারা মার্কিন দেশ ও কানাডা জুড়ে ভিয়েতনামে যুদ্ধ-বিরোধী যে সমস্ত বিক্ষোভ চলছিলো, ছাত্র হিসেবে হরি শর্মা সেই বিক্ষোভে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। সমাজিক অসামঞ্জস্য বস্তুবাদ এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হরি শর্মাকে আকর্ষণ করেছে আজীবন। এমন অনেক প্রগতিশীল এবং সংগ্রামী ব্যক্তির দেখা মিলবে যাঁরা বৃহত্তর সার্বজনিক অসাম্যের প্রতিবাদে যতটা মুখর, নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অসাম্য, অন্যায়ের ঘটনায় ততটা মুখর নন। হরি শর্মা সেই বিরল ব্যক্তিদের মধ্যে একজন-যাঁরা বিদেশী হওয়ার কারনে প্রচুর ঝুঁকি নিয়েও কানাডার বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে বৌদ্ধিক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রীকরণের আন্দোলনের সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে দ্বিধা করেননি। ৭০-এর দশকের শুরুতে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামী অধ্যাপক ক্যাথলিন গুফ-কে তাঁর রাজনৈতিক মতামতের জন্য কানাডা সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ থেকে বরখাস্ত করে। হরি শর্মা এমন এক বিপজ্জনক সময়ে অধ্যাপক গুফ-এর সঙ্গে "দক্ষিণ এশিয়ার বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ" নামক এক বিখ্যাত পুস্তক সম্পাদনা করেন।

কিন্তু কেবলমাত্র এই সমস্ত কারণের জন্যই নয়, হরি শর্মা ভারতের অসংখ্য মানুষের কাছের লোক হয়ে ওঠেন তাঁর স্বদেশপ্রীতি এবং ভারতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার সঙ্গে সাধ্যমতো সংহতি জ্ঞাপনের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য। তিনি ১৯৭৬ সালে কানাডায় "ইনডিয়ান পিপল্‌স এ্যাসোসিয়েসন অব নর্থ আমেরিকা" নামক সংগঠন গড়ে তোলেন - এই সংগঠনটি ভারতের নানান গণআন্দোলনে নানাভাবে সহায়তা প্রদান করতো।

ভারতে যখন জরুরি অবস্থা জারি হয় এবং ভারতের কারাগারগুলিতে বিনা বিচারে অতিক বন্দী যখন উপচে পড়ে, তখন হরি শর্মা ভারতের কারাগারগুলির ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করার জন্য লন্ডন-এ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জেনেভার কমিশন অফ জুরিস্টস্-এ যান। তিনি ইউএন হিউম্যান রাইটস কমিশনে ভারতের কারাগারগুলির অবস্থা বর্ণনা করে লিখিত প্রতিবেদন পাঠান। তিনি ইংল্যান্ড, মার্কিন দেশ, কানাডা প্রভৃতি দেশের ভারতীয়দের একজোট করে ভারতের বিচারাধীন বন্দীদের মুক্ত করার বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযান সংগঠিত করেন। এই প্রচারের ফলে ভারত সরকার একটু নড়ে-চড়ে বসে এবং ভারতের কারাগারের বন্দীরা আগের চেয়ে একটু বেশি মানুষের মতো ব্যবহার পাওয়া শুরু করেন।

হরি শর্মার ভারতের প্রতি আগ্রহ ছিলো অনিঃশেষ। তিনি স্বর্ণমন্দিরে হত্যার বিরোধীতা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দিল্লিতে যে ভয়াবহ শিখ-বিরোধী দাঙ্গা হয় তাতে তিনি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মানুষদের পাশে কার্যকর সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হন। ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে অত্যাচারের সম্মুখীন হন, হরি শর্মা তার বিরুদ্ধে আমৃত্যু সোচ্চার ছিলেন। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো যখন সারা পৃথিবীতে রাম-জন্মভূমি নিয়ে বিশ্বজনমত গঠনের জন্য সংগঠন করার চেষ্টা চালাচ্ছিলো, হরি শর্মা এই প্রচেষ্টার পাল্টা হিসেবে এক আন্তর্জাতিক সংহতি মঞ্চ গড়ে তোলেন।

হরি শর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোমাগাতামারু জাহাজের শিখদের ওপর অত্যাচারের ৭৫ বর্ষ পূর্তি স্মরণসভা আয়োজিত হয়। গুজরাট দাঙ্গা, ভাগলপুর দাঙ্গা প্রভৃতি প্রতিটি কলঙ্কজনক ঘটনায় হরি শর্মার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর অত্যাচারিত মানুষকে সাহস জোগান দিয়েছে। ভারতের এবং পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের পরবর্তী সময়ে শান্তির স্বপক্ষে এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিপক্ষে জনমত গঠন করার বিষয়ে হরি শর্মা চমকপদ সাংগঠনিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন. মূলত তাঁর প্রচেষ্টায় বিদেশে বসবাসকারী জন্মসূত্রে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি "নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান ফর সেকুলারিজম এ্যান্ড ডেমোক্রাসী" এবং "সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর সেকুলারিজম এ্যান্ড ডেমোক্রাসী" নামক দুটি মান্য এবং সক্রিয় সংগঠন গড়ে তোলেন।

এত সমস্ত কিছু করেও হরি শর্মা চমৎকার কবিতা লিখতেন, লিখতেন সমাজ সচেতন নাটক। তাঁর লেখা অনেক নাটক বিভিন্ন সময়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। ছিল চিত্র ছিলো তাঁর নেশা-তাঁর চিত্র পেশাদারী চিত্রকরদের সঙ্গে একযোগে প্রদর্শিত হয়েছে। বিদেশ গল্পকার হিসেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা রয়েছে।

এমন একজন পূর্ণ মানব, সংবেদনশীল এবং মননশীল চেতনার অধিকারী হরি শর্মা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন ক্যান্সার রোগের কাছে। মৃত্যু সমুপস্থিত জেনেও তাঁর ক্রিয়াশীল মনন এবং ক্ষুরধার লেখনি তাদের কাজ চালিয়ে গেছে।

ভারতে এলেই তিনি কোলকাতা শহর একবারও না ঘুরে কখনও প্রবাসে প্রত্যাবর্তন করেননি। পশ্চিমবঙ্গের গণবিজ্ঞান আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ছিলো বাঁধনহারা। একটি মাত্র ই মেল পেলেই তিনি রাশি রাশি লেখা দলিল পাঠিয়ে নানান আন্দোলনে সহায়তা দিয়েছেন - তা সে ভূপাল গ্যাস কান্ডই হোক বা ডানলপ সুপার মসলেট সাপের বিষময় দিনই হোক। তাঁর মৃত্যু আমদের কাছে আত্মীয় বিয়োগের সমান।

ব্রাজিলের কথা

লাতিন আমেরিকায় প্রায় এক নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে লুলার পর ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি হলেন শ্রীমতি ডিলমা রউসেফ। "আধুনিকতার পীঠস্থান" মার্কিন দেশে যা কোনও কালেও ঘটেনি, অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন একজন মহিলা। সেই ঘটনা ঘটিয়ে ব্রাজিলের জনগণ প্রমাণ করলেন যে মানুষের চামড়ার ত্বকের তলায় মেলানিন যৌগের ঘাটতি অধিক বুদ্ধি, অধিক গণতান্ত্রিক চেতনা এসব কিছুই সূচিত করেনা। মানুষের চামড়ার রং নয়, মানুষের ন্যায় বিচার বুদ্ধিই মনুষ্যত্বের দ্যোতক।

সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে চিলির জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি সালভাদর আলেন্দে-কে হত্যা করার পর মার্কিন দেশের আর সাহস হয়নি যে তারা লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে নগ্নভাবে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জনপ্রিয় সরকার উল্টে দেবে। লুলা রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ই জনগণের সুবিধার্থে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার অনেকগুলোরই রূপায়ণের মুখ্য রূপকার ছিলেন এই ডিলমা। আজকের দিনে সর্ববিষয়ে মার্কিন উদাহরণ অনুকরণ (নাকি হনুকরণ বলা উচিত হবে!) করার যে ঘৃণ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে

তার বিপরীতে ব্রাজিলের কয়েকটি সদর্থক পদক্ষেপ নিয়ে দুকথা বলার সময় হয়েছে

ব্রাজিল সরকার "বোলসা ফ্যামিলিয়া" বা পারিবারিক ভাতা নামে এক অনন্য প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের মূল কথা হলো যে সমস্ত গরিব পরিবার তাদের পারিবারের শিশু এবং কিশোর পড়ুয়াদের শিশুশ্রমে নিযুক্ত না করে পড়ার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাবে, সেই সমস্ত পরিবারের জন্য সরকার নির্দিষ্ট ভাতার বন্দোবস্ত করবে। কড়ার হলো এই যে পরিবারের শিশু বা কিশোরটিকে ৮৫ শতাংশ ক্লাস করতে হবে। তার চেয়ে কম ক্লাস করলে সরকার ঐ পরিবারের ভাতা বন্ধ করে দেবে। পারিবারিক ভাতা ছাড়াও ঐ পরিবারগুলিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষার বন্দোবস্তও করে দেবে সরকার।

ব্রাজিল সরকার এছাড়াও সিটিপি বা ক্যাশ ট্রান্সফার প্রোগ্রাম চালু করেছিলো যাতে পরিবারের পড়ুয়াদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেরণের সঙ্গে আর্থিক অনুদান সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিলো, তা আশাতীত সাফল্যলাভ করে। ২০০৩ সালে লুলা রাষ্ট্রপতি হয়েই এই প্রকল্পকে বহুদূর এবং বহুগুণ প্রসারিত করেন। বর্তমানে ব্রাজিলের ১ কোটি ২৪ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় থেকে সামাজিক সুবিধা ভোগ করছেন।

নিউ ইয়র্ক শহরে বেকার এবং শহরে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে নিউ ইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ ব্রাজিল থেকে এই ধারণা ধার করে খুবই সীমাবদ্ধ স্তরে এই অনুশীলনে ভালো ফল পেয়েছেন। বিশ্বব্যাঙ্ক-ও বাধ্য হয়েই বলছে যে বাজার অর্থনীতির নিয়মের বাইরে হলেও ব্রাজিলের এই বোলসা ফ্যামিলিয়া এবং সিটিপি প্রকল্পগুলো সার্থক বিকল্প - এই পরীক্ষা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো করতে পারে।

এই সমস্ত সামাজিক সুরক্ষার অপ্রত্যক্ষ ফলও ব্রাজিলের পক্ষে যথেষ্ট সুখকর হয়েছে সন্দেহ নেই। ব্রাজিলে যে সব পারিবারের মাসিক আয় ৪৪০ ডলারের কম, ২০০৩ সালের পর থেকে, অর্থাৎ লুলা রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকেই এই সমস্ত পারিবারের সংখ্যা প্রতি বছর ৮ শতাংশ হারে কমে আসছে।

আয়-বৈষম্য পরিমাপের একটি মান্য এবং পরিচিত গুণাঙ্ক হলো জিনি গুণাঙ্ক। এই গুণাঙ্কের মান যত কম, আয়-বৈষম্যের পরিমাণও তত কম। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে এই গুণাঙ্ক ০.৫৮ থেকে কমে হয়েছে ০.৫৪ - ব্রাজিলের মতো দেশের ক্ষেত্রে এই হ্রাস সবদিক থেকেই ভালো অবস্থার পরিচায়ক। এর মূল কারণ অবশ্যই সর্বনিম্ন আয়ের মানুষদের বাস্তব মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি। একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে দারিদ্র্যদূরীকরণের ৬ ভাগের ১ ভাগ ঘটেছে এই বোলসা ফ্যামিলিয়া প্রকল্পের জন্য। এই বোলসা প্রকল্পের জন্য ব্রাজিল তার জিডিপি-র মাত্র ০.৫ শতাংশ বরাদ্দ করেছে আর তাতেই সমাজের আর্থিক সঙ্গতির নিরিখে নীচের দিকের মানুষের এমন চিত্তাকর্ষক উন্নতি ঘটেছে।

ব্রাজিলে এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে গ্রামের গরিব পরিবারগুলোর ৪১ শতাংশ আর শহরের গরিব পরিবার গুলোর ১৭ শতাংশ। ব্রাজিলের তীব্র দারিদ্র ১২ শতাংশ হারে কমছে - শিশু শ্রমিকের সংখ্যাও কমছে। এর কোনোটাই গ্যাট নির্দেশিত পথে আসেনি - এসেছে গ্যাট-নির্ধারিত পথের পুরোপুরি উল্টো পথে হেঁটে। এই বিপরীত যাত্রা সম্ভব, ব্রাজিল তা বিশ্বের জনগণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো কটা দেশের রাষ্ট্রনায়কই বা লুলার মতো হিম্মত দেখাতে প্রস্তুত আছেন?

যে বেগুন শিয়ালেও খায় না

বিটি তুলোর পর মনসান্টো সংস্থা তার ভারতীয় সহযোগী (যে সংস্থাতে ভারত সরকারেরও অংশীদারিত্ব রয়েছে) মাহিকা সংস্থার মাধ্যমে ভারতের মাটিতে বিটি বেগুন আনতে চলেছে। বিটি তুলো চাষ করে অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুর কৃষকরা জহরব্রত বেছে নিয়েছিল - গত বছর পর্যন্ত বিটি তুলো চাষে সর্বনাশ হওয়ায় তাঁরা প্রতিদিন গড়ে তিনজন করে হয় গলায় ফাঁস লাগিয়ে নয় চাষের ক্ষেতে ছড়ানোর কীটনাশক খেয়ে ঋণের ফাঁস এড়াতে চেয়েছেন। মৃত্যুর মিছিলে মানুষের সংখ্যা ছাড়িয়েছে বেশ কয়েক লক্ষ।

কিন্তু মুনাফার চেয়ে সুন্দর আর কিছুই নেই - তাই মনসান্টো চুপি চুপি ভারতের বাজারে বিটি বেগুন আনতে চলেছে। প্রথম ধাক্কায় অবশ্য পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশের পরাজয় ঘটেছে ভারতের জনগণের সংঘশক্তির কাছে - কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হলো। যা হলো তা হচ্ছে প্রকল্পটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলো। কোনও এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সরকারের আরও কোনও সংঘটিত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে

আন্দোলনকারীরা যখন ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তখন এই বিটি বেগুন চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।

জয়রাম রমেশ মহাশয় বিটি বেগুনের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে জনমত যাচাই-এর জন্য সারা ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলো বেছে নিয়েছিলেন। কোনও শহরের মানুষরাই বিটি বেগুনের সপক্ষে ছাড়পত্র দেননি। রমেশকে কোথাও বেগুনের মালা, কোথাও জুতোর মালাও পরতে হয়েছে। তার কারণ ছিলো যে পদ্ধতিতে রমেশ এবং তাঁর সরকার এই বিটি বেগুনের জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার আয়োজন করছিলো, তাতে বিজ্ঞান এবং জনগণের স্বাস্থ্যের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিবর্তে সরকারের মনসান্টোর প্রতি দায়বদ্ধতা ফুটে উঠেছিলো।

বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে মাহিকো প্রদত্ত মাঠস্তরের তথ্যগুলো অমসৃণ, এমনকি তা রাশিবিজ্ঞান সম্মতও নয়। যে তথ্যের ওপর রাশিবিজ্ঞান মতে যে পরীক্ষা (statistical tests) করা যায় না, মাহিকো সেই পরীক্ষা করে ভালো ফল পেয়েছে বলে দাবি করেছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে মাহিকো যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, ঐ তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো অসম্ভব। সারা বছরের তথ্য নেই - তথ্যের ফাঁক আগের বছরের গড় তথ্য দিয়ে পূরণ করা হয়েছে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! ভারতের যে কমিটিটি জীনপ্রযুক্তিজাত খাদ্য দ্রব্য বাজারজাত হবে কি হবে না তা নিরূপণ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত, সেই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এপ্রুভাল কমিটি এমন অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতেই বিটি বেগুনকে প্রাথমিক ছাড়পত্র দিয়ে বসেছিলো। বলাই বাহুল্য, সেই কমিটিতে কোনও জিন প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ ছিলেন না - তার পরিবর্তে ছিলেন অনেক আমলা (এর মধ্যে তিনজন সমাজ বিজ্ঞানের ডিগ্রিপ্রাপ্ত।) এবং সদস্যদের ৪৫ শতাংশ কোনও না কোনও ভাবে মাহিকো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি শব্দ নিয়ে ভারতের শাসক এবং তাঁদের সমর্থক মুরুব্বিদের স্পর্শকাতরতাকে বিশ্বায়ন এবং আধুনিকতার সম্মার্জনী সযত্নে বিদায় দিলেও ভারতের আম-জনতা এই বিষয়গুলিকে আজও মূল্য দেন।

এই নিয়ে জল গড়ায় সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত, একাধিক সংস্থা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে আরও অনেক কেলেঙ্কারির চাঞ্চল্যকর তথ্য সংগ্রহ করে। এসবের সম্মিলিত চাপে সুপ্রীম কোর্ট ভারত সরকারকে নির্দেশ দেয় যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এপ্রুভাল কমিটিতে যেহেতু একজনও জিন প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ নেই, অতএব মাত্র একজন মান্য জীনপ্রযুক্তি বিজ্ঞানীকে এই কমিটির সদস্য করতে হবে এবং তাঁর মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে হবে। কিন্তু পরের মিটিং-এর দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পরও সেই বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীকে মাহিকো প্রদত্ত তথ্য এবং অন্যান্য দলিলপত্র পাঠানো হয় না। সেই বিজ্ঞানী বারবার কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তিনি নিরুত্তর থাকেন। অবশেষে মিটিং-এর আগের দিন বিকেলে ডাকযোগে সর্বমোট ১৩১৪ পৃষ্ঠার নানান দলিল পাঠিয়ে পরের দিন সকাল ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে তাঁর "মূল্যবান ও সুচিন্তিত মতামত" লিখিতভাবে নিয়ে হাজির থাকতে বলা হয়। তিনি সেইদিন রাতেই কমিটির চেয়ারম্যানকে জানান যে তথ্যে কারচুপি আছে - ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া সাতদিন পেছোনো হোক - তিনি তাঁর মতামত তার মধ্যে জানাবেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেননি - উল্টে ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি (ঠিকই ধরেছেন, ইনি এবং এনার স্ত্রী মাহিকোর টেকনিক্যাল পরামর্শদাতা) বলেন যে পুরো প্রক্রিয়া এতটাই অগ্রসর হয়ে গেছে যে তা এখন আর প্রত্যাহার করা কার্যত অসম্ভব।

এই সময়েই একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় যার রচয়িতা হলেন অধ্যাপক সেরালিনি - জিন প্রযুক্তির বিজ্ঞানী হিসেবে যাঁর অবদান এবং গ্রহণযোগ্যতা তর্কাতীত। তিনি মাহিকোর প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং মাহিকোর কয়েকটি পরীক্ষা পুনারায় করে সিদ্ধান্ত করেন যে মাহিকোর তথ্যে কারচুপি আছে - তাদের পরীক্ষাগুলির পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং পরীক্ষাগুলি পরীক্ষাগারে করলে মাহিকো বর্ণিত তথ্যের বিপরীত তথ্যই পাওয়া যাচ্ছে। সেরালিনির পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করে আরও কয়েক গন্ডা গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় - ভারতের একটি মান্য গবেষণাগারও বলে যে মাহিকোর তথ্য এবং সেই তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত টানার পদ্ধতি রাশিবিজ্ঞান সম্মত নয়। তাতে কী এলো গেলো। ভারতের মানুষের জীবনের দাম তো মনসান্টোর মুনাফার চেয়ে বেশি নয়।

বোমা ও নিরস্ত্রীকরণ

১৯৫৮ সালে নিউক্লিয়ার বোমা বিরোধী সংগঠন 'ক্যামপেন ফর নিউক্লিয়ার ডিস্‌আর্মামেন্ট' বা সংক্ষেপে সি এন ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছর লন্ডন থেকে অলডারমেসটন পর্যন্ত এক বিরাট মিছিল যায়। ২০০৮ সালে সেই ঘটনার স্মরণে জাপানের

হিব ক্রুশা সহ প্রায় ৫০০০ ব্যক্তি জাপানের সর্ববৃহৎ নিউক্লিয়ার সংস্থার সামনে একটি বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে।

১৯৬০-এর দশকে ঐ পদযাত্রা তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায় - হাজার হাজার যুদ্ধ এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্র-বিরোধী মানুষ ঐ পদযাত্রায় যোগ দেন। বৃটেনে এই আন্দোলন ক্রমে ক্রমে আরও বেশি করে দানা বাঁধতে থাকে। ঐ একই দিনে বৃটেনের অনেক যুদ্ধবিরোধী মানুষ ঐ দেশের সর্ববৃহৎ মিশাইল কারখানার চারপাশে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন। বৃটিশ সরকার অলডারমেনটন সংস্থায় নিউক্লিয়ার বোমার ক্ষুদে সংস্করণ বানানর জন্য প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার খরচা করছ।

ঐ সংস্থাটি ৮ বর্গ কিমি অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত - তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সুবৃহৎ লেসার রশ্মি দিয়ে গবেষণাগারেই নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটানর সুবিধাযুক্ত 'ওরায়ন' ব্যবস্থা। আসলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার সিটিবিটি -তে সই দিয়েও ইচ্ছামতো পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের গবেষণা চালাতে পারবে।

যখন ন্যাটো ছিলো এবং মার্কিন দেশ এবং পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ছিলো, সেই আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সারা ইউরোপ জুড়ে কম-বেশি ৬৫০০০ নিউক্লিয়ার বোমা বিভিন্ন দেশের সীমান্ত জুড়ে ছড়ানো ছিলো। সারা পৃথিবীর যে সামরিক বাজেটের হিসেব সাধারণ মানুষ জানতে পারতেন, তার ৮৫ শতাংশই ব্যায়িত হতো ন্যাটো-র ঐ নিউক্লিয়ার বোমাগুলোকে ব্যবহারযোগ্য করে রাখার পেছনেই।

সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এবং অস্ত্রপ্রতিযোগিতার পরিবর্তে মার্কিন দেশের অস্ত্রবিষয়ে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকের মনে হয়েছিলো যে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিপদ বুঝি শেষ পর্যন্ত কেটে গেলো। কিন্তু পৃথিবীতে বর্তমানে রাজনৈতিক শক্তির যেমন বিন্যাস রয়েছে তাতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা কমে আসা বা থেমে যাওয়ার কোনও কারণ নেই বরং সেই প্রতিযোগিতার ক্রমাগত বৃদ্ধি হওয়ারই কথা।

হিরোসিমার পর "নিউক্লিয়ার বোমা" সাম্রাজ্যতন্ত্র, হুমকি এবং যুদ্ধ-উন্মাদনার সমার্থক হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর অন্তত একটি দেশকে নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। প্রতিটি নিউক্লিয়ার বোমা সমৃদ্ধ দেশ তাদের নিরস্ত্রীকরণের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে প্রাণপণে নতুন নতুন এবং আরও উন্নত নিউক্লিয়ার বোমা জমাতে শুরু করেছে। বুশ এবং ব্লেয়ার একযোগে পূর্বতন রাশিয়া এবং চীনকে লক্ষ্যবস্তু করে "তারকা যুদ্ধের পুত্র" এই সাংকেতিক নামে মিশাইল প্রকল্প চালু করেছে। আই এ ই এ-র মতে এই দশকেই আরও ১৫টি দেশ তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে উন্নত নিউক্লিয়ার বোমা বানাতে সক্ষম হবে। তখন দ্বি-পাক্ষিক এর পরিবর্তে বহুপাক্ষিক যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে তার ফলে নিউক্লিয়ার নিবৃত্তিকরণের বস্তাপচা পুরোনো তত্ত্বটি শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আবর্জনাকুন্ডে বিসর্জিত হবে সন্দেহ নেই।

মার্কিন দেশের তথাকথিত "সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জেহাদ" তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী দলগুলোকেও নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে। এক সময় যে সমস্ত শক্তিকে মার্কিন দেশ সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র করার পরিকল্পনা নিয়েছিলো, সেই গোষ্ঠীর অনেকেই আজ মার্কিন-বিরোধী হয়ে পড়েছে। তাদের হাতে যা প্রযুক্তি রয়েছে তা দিয়ে তারা যেকোনও সময় ছোট ছোট নিউক্লিয়ার বোমা বানাতে সক্ষম হবে। বস্তুত আই এইএ-র হিসেব মতে প্রতি বছরে প্রায় ১৫০ টি করে নিউক্লিয়ার বোমা সংক্রান্ত বিভিন্ন দ্রব্য স্রেফ চুরি যায় - এগুলো এক জায়গায় করলে অনায়াসেই ছোট নিউক্লিয়ার বোমা বানানো সম্ভব।

অতি সম্প্রতি এই নিবৃত্তিকরণ নিয়ে একটি হাস্যকর ঘটনা ঘটেছে। বৃটেনের একটি নিউক্লিয়ার মিশাইল কারখানায় একজন সাংবাদিক অনেক মিশাইল দেখে সামরিক প্রধানকে প্রশ্ন করেন, "কোন শত্রুর বিরুদ্ধে এই মিশাইলের আয়োজন?" উত্তর আসে, "কোনো বিশেষ শত্রুর বিরুদ্ধে নয় এগুলো"। আবার প্রশ্ন "তাহলে এগুলো কাদের দিকে তাক্ করা?" উত্তর আসে, "কারুর দিকে নয় - এগুলো আছে জানলে কেউ আমাদের দিকে তাক্ করবে না।"

এই হাস্যকর অবস্থা বজায় রাখার জন্য অন্য যে সমস্ত ফ্রন্ট-এ যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা কোনও নিউক্লিয়ার অস্ত্র, কোনও মিশাইলের নেই নিউক্লিয়ার বোমার পেছনে ক্রমাগত আর্থিক জোগান বজায় রাখার জন্য পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি বাষ্পীভূত হয়েছে মার্কিন দেশের অবস্থা টলোমলো। অস্ত্র প্রতিযোগিতা শত্রুতার জন্ম দিয়েছে - অস্থির হয়েছে সারা বিশ্ব। এর ফলে অতি উৎপাদনের ফল হিসেবে এসেছে বিশ্বউষ্ণায়ন, এসেছে বিশ্বের অর্থনৈতিক বুদ্বুদের ফেটে যাওয়ার ঘটনা - একের পর এক আর্থিক সংস্থা

হয়ে গেছে দেউলিয়া। মিশাইল নিয়ে যুদ্ধ এই অবস্থার সামাল দিতে অপারগ।

"ভূতের মুখে রাম নাম" -এর মতোই ঘটনা ঘটেছে। হেনরি কিসিংগার, জর্জ সুলজ -এর মতো শীতল যুদ্ধের নেতৃবৃন্দ ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে চিঠি দিয়ে জানাচ্ছেন যে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রতিযোগিতা খারাপ - নিরস্ত্রীকরণ উত্তম প্রস্তাব। মার্কিন দেশ ও রাশিয়া তাদের জমানো অস্ত্র ধ্বংস করুক - এর ফলে অস্ত্র ব্যবস্থাপনা খাতে যে বিপুল অর্থ বাঁচবে তাই দিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ণের মোকাবেলা করা হোক।

বুশ পরিবার লক হিড সংস্থা থেকে মাসোহারা পায় - এই সংস্থা যুদ্ধবিমান বানায়। ইতিমধ্যেই বেট্চেল এবং লকহিড বিশ্বউষ্ণায়ণের বরাদ্দ টাকার ১৮ শতাংশ মেরে দিয়ে নতুন নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মহড়ায় নেমেছে। বিশ্বজনমত যত নিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিরুদ্ধে যাচ্ছে ততই রাশিয়া-আমেরিকা তাদের পুরোণো নিউক্লিয়ার অস্ত্র এবং পরমাণু চুক্তি ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চালান করছে। তবে আশার কথা, কর্তাব্যক্তিদের নিউক্লিয়ার পরিকল্পনা বিশ্বের মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।

"ডলফিন নিধন উৎসব"

উত্তর আটল্যান্টিকের একটি আকর্ষনীয় প্রাণী - 'কলডেরন ডলফিন'। স্তন্যপায়ী অত্যন্ত বুদ্ধিমান (তবে মানুষের সাথে পেরে ওঠেনা) এই ডলফিন মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। লম্বায় ১৫-২০ ফুটের এদের এক একটির ওজন এক থেকে তিন টনের মত। হিসেব বলছে এদের সংখ্যা ২৫ লাখের কাছাকাছি।

সাধারণভাবে 'কলডেরন ডলফিনে'র বাঁচার কথা ৪০-৬০ বছর। কিন্তু এদের দলবদ্ধভাবে থাকার অভ্যেসের জন্য এরা বেশীদিন বাঁচতে পারছেনা। এদের নিধন যজ্ঞ আজও চালু আছে পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে। উল্লেখযোগ্য এই নিধনপর্ব আজও চলছে ফ্যারোদ্বীপে, জাপানে ও শ্রীলঙ্কায়। সারা বিশ্ব ফ্যারোদ্বীপ ঐতিহ্যের নামে ডলফিন হত্যালীলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। চলছে বিভিন্নভাবে জনমত তৈরীর প্রচেষ্টা। সচেতন যে কোন ব্যক্তি এই প্রচেষ্টায় অংশ নিতে পারেন।

ফ্যারোদ্বীপে বিশেষ বিশেষ দিনে (তারমধ্যে পরিবেশ দিবসও আছে) এই ডলফিনের ঝাঁককে সারি সারি জেলে নৌকা দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলা হয়। তারপর তিনদিক তটভূমি দিয়ে ঘেরা অঞ্চলে এদের ঢোকানো হয়। এর পর শুরু হয় লাঠি দিয়ে খোঁচানো। ডলফিনের আর্তনাদ ও সমুদ্রের লাল হয়ে ওঠা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে ভিড় করে থাকা অধিবাসীরা। কর্মচারীরাও এই উদ্যোগে সামিল হবার জন্য বিশেষ ভাতা পেয়ে থাকে। এ এক মজার উৎসব, পূজোমণ্ডপে পশুবলি এভাবেই উপভোগ করত বাঙালী।

উত্তর আটল্যান্টিকের (নরওয়ে ও আইস্ল্যান্ডের মাঝামাঝি) ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জে আছে ১৭টি বাসযোগ্য দ্বীপ। এগুলি ডেনমার্কের অধীনস্থ। এখানকার বাসিন্দারা প্রধানতঃ নর্স (Norse) ও ভাইকিং (Viking) দের বংশধর এবং স্কটিশ। ছেলেরা যৌবনের প্রকাশ হিসেবে ডলফিন শিকার করবে এটা ফ্যারোদ্বীপের নাকি প্রথা। দলবদ্ধ ডলফিন হত্যা করে, মাংস বিলি করে। জাপান ও শ্রীলঙ্কায় এনিয়ম আলাদা হলেও নিধন আছে।

আশির দশকে ফ্যারোদ্বীপে বছরে গড়ে দু-তিন হাজার ডলফিন এভাবে হত্যা করা হোত। বর্তমানে সংখ্যাটি সামান্য কম। ৫-ই জুন (পরিবেশ দিবস) ডেনমার্কের সংবিধান দিবস (Constitution Day) ও বটে। কিন্তু এমন দিনেই ঘটছে এই হত্যাকান্ড। ডেনিশ সরকারের Ottowa দূতাবাস এই প্রসঙ্গে ৬ই জুন ২০০৯-এ জানিয়েছিল "ফ্যারোর সমুদ্র ও মৎস দপ্তর ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে নয়। ফ্যারো ডেনমার্কের অন্তর্গত একটি স্বশাসিত অঞ্চল।" যদিও এই দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ডেনমার্কের রানী Margrethe II, কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকেই ফ্যারোর নিজস্ব আইনসভা ও প্রধানমন্ত্রী বর্তমান।

ফ্যারোর মৎস দপ্তরের সরকারী বক্তব্য অবশ্য হোল - "এ দেশে ডলফিনের মাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জাতীয় খাদ্য তালিকায় ডলফিনের মাংস ও পটকা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যেখানে এই শিকার চলে সেখানকার অধিবাসীদের বিনে পয়সায় এই মাংস বিতরণ করা হয় (....অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছুরি দিয়ে এমনভাবে ডলফিন মারা হয়, যাতে মুহূর্তে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হতে পারে। এর ফলে যন্ত্রণার বোধ থাকে না। এই পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশী 'দক্ষ' ও 'মানবিক'তার সাথে এই হত্যাকান্ড চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া, অভিজ্ঞ ডলফিন শিকারীরা নিত্য নতুন শিকারের সরঞ্জাম উদ্ভাবন করে চলেছে। যেমন তাদের তৈরী করা ভোঁতা 'ব্লো-হোল-হুক' গত দশবছর ধরে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ডলফিনের পক্ষে কম যন্ত্রণাদায়ক। ....ইত্যাদি ইত্যাদি।"

২০০৯-এ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে (EU) এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। ফ্যারোদ্বীপ ডেনমার্কের অন্তর্গত একটি স্বশাসিত অঞ্চল, তাই তাদের নিজস্ব জলসীমার মধ্যে এধরণের শিকার বন্ধ করার নৈতিক অধিকার ইউরোপিয় ইউনিয়নের নেই বলে জানিয়ে দেয় EU। অথচ সীল মাছ শিকারের অপরাধে EU নিষেধাজ্ঞা জারি করে কানাডা থেকে সীলের শরীরজাত দ্রব্য আমদানী বন্ধ করে। উল্লেখ্য কানাডা ইউরোপিয় ইউনিয়নে নেই। ফ্যারোদ্বীপের ক্ষেত্রে তাহলে এই ছাড় কি অন্য কোন বাধ্যবাধকতা?

ফ্যারো দ্বীপ নিয়ে ডেনমার্কের স্বস্তি ছিলনা কখনও। অনেক ঝুটঝামেলার পর ১৭০৮ সালে ফ্যারোদ্বীপপুঞ্জের সবরকম ব্যবসা (উল, মাছ ও মাংস) নিজেদের সরকারের দখলে আনে ডেনমার্ক। তবে পুরোপুরি দখলে আসে ১৮১৪-তে। তারপর পুরো শতক ধরে চলে স্বাধীনতা আন্দোলন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী ডেনমার্ক আক্রমণ করলে, বৃটিশরা ফ্যারোর দখল নেয়। ফ্যারোদ্বীপ জলজাহাজ ঘাটি (Submarine base) হিসেবে জার্মানদের কাছে লোভনীয় ছিল। বৃটিশরা সে রাস্তায় হাঁটেনি। ফ্যারোর বিপুল সংখ্যক জেলে নৌকা ও মাছ তাদের বেশী আকর্ষণ করে। যুদ্ধঘাটি বানায় অন্যত্র। বৃটিশরা ১৯৪৫-এ ফ্যারো ছেড়ে চলে যাবার সময় ফ্যারোর ছিল প্রাদেশিক আইনসভা। এর সংসদীয় ক্ষমতা থাকলেও অনেক প্রশাসনিক ক্ষমতাই ডেনিশ নিযুক্ত প্রতিনিধির হাতে থাকে। বৃটিশরা মাছে নিমজ্জিত ছিল। ডেনিশ-দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্যারোর প্রশাসনে নাক না গলানোর সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৬ এ ফ্যারোর নাগরিকরা পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষে রায় দিলে ১৯৪৮ সালে ফ্যারো-কে শুধুমাত্র আইনী স্বাশসন দেয় ডেনমার্ক।

১৯৭৩-এ ডেনমার্ক ইউরোপিয়ান কম্যুনিটি (বর্তমানে EU) -এর সদস্য হলেও ফ্যারো তা অস্বীকার করে প্রধানত মাছ ধরার উপর নিয়ন্ত্রণ মানা সম্ভব নয় বলে। নূতন প্রযুক্তির ব্যবহারে তখ- মাছ উৎপাদন হচ্ছে বিপুল, বাড়ছে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী।

নব্বুই-এর দশকে ফ্যারোর স্বাধীনতা আন্দোলন সাময়িক ধাক্কা খায়। সরকার বেহিসেবী খরচ করায় অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়তে থাকে। বেকারত্ব চরমসীমায় পৌঁছয় (১৯৯৪-এ ২৬ শতাংশ)। সরকারী কর্মচারীদের বেতনে ছাঁটাই আসে। এই সময়ই ডলফিন হত্যালীলার বিরোধীতায় ফ্যারোর উৎপাদিত দ্রব্যের উপর বৃটেন ও জার্মানীর অনেক বাজারে স্থানীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা করা হয়; এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগ নেয় উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের **Environmental Investigation Agency, the Whale and Dolphin Conservation Society** এবং **World society for the protection of animals**। ডেনমার্কও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করার ইঙ্গিত দিতে থাকে।

ফ্যারোর মাছ ব্যবসায় আকৃষ্ট হয়ে তার উপর কর্তৃত্ব নিলেও কোন রাষ্ট্র বা জাতিই কোন কালেই ডলফিন নিধন উৎসবের মত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে ফ্যারোর মাছের উপর দখল হারাবার ঝুঁকি নিতে চায়নি। এখন আন্তর্জাতিক চাপ আসছে। কিন্তু ডেনমার্কের Ottowa দূতাবাসের ৬/৬/২০০৯-এর বিবৃতি থেকে স্পষ্ট, ডেনমার্ক এই মারণযজ্ঞ বন্ধ করতে কিছুই করবে না, যদি ইচ্ছে থাকেও। কারণ ফ্যারো হাতছাড়া হতে পারে। ২০০০-এর পর থেকে বেকারত্বের সমস্যা কমেছে। মাছ উৎপাদনে কোন খামতি নেই এখন। খনিজ তেল আবিষ্কার হয়েছে। জনসংখ্যারও তেমন বৃদ্ধি হয়নি গত ১৫ বছরে। সুতরাং ভয় ডেনমার্ক থেকে মুক্তিরদাবী মারাত্মক ভাবে উঠতে পারে যেকোন অজুহাত পেলেই।

ফ্যারোর রাজনৈতিক সমীকরণও সেখানকার আইনসভাকে কখনও ডলফিন হত্যা বন্ধের মত কোন কড়া পদক্ষেপ নিতে দেবে বলে মনে হয়না। ৩৩ সদস্যের সংসদে বহুদলীয় মিলিজুলি সরকার গঠিত হয় এখানে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ১৯৩২-এ ফ্যারোর আইন সভায় অনেক টালবাহানার পর প্রথম আইন পাশ হয় এই হত্যালীলায় নিয়ন্ত্রণ আনতে। ফ্যারোর **Pilot (Calderon) Whaler's Association** ডলফিন হত্যা নিয়ে বিতর্ক / আলোচনা চালু করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা **NAMMCO** (১৯৯২) গঠিত হয়েছে, ফ্যারো, গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও নরওয়ের মধ্যে চুক্তির ফলস্বরূপ, ডলফিন সংরক্ষণ এবং ব্যবসায় সহযোগিতার জন্য। এই সংস্থা ও ডেনমার্কের মাধ্যমে ফ্যারো ডলফিন শিকার সংক্রান্ত তথ্য পাঠায় আন্তর্জাতিক সংস্থা IWC -তে। এসবে বাৎসরিক ডলফিন হত্যার মাত্রা কিছুটা কমে। কিন্তু ৩০০ বছরের এই খারাপ প্রথা প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৩২-এর আইন ও তার পরবর্তী সংযোজন প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি আরও পোক্ত করেছে মাত্র। পরিবেশবিদ ও প্রতিবাদীদের স্বস্তি দিতে পারেনি।

তবে কারণ যাই হোকনা কেন, একবিংশ শতাব্দীর নিরিখে ডলফিন নিধনের এই প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কদর্য।

- শ্রীপর্ণা নিয়োগী ও বিপ্লব শিকদার

প্রয়াত মার্টিন গার্ডনার

গত ২২ শে মে ২০১০ পরা-বিজ্ঞানকে (pseudo science) পরাস্ত করার অগ্রগামী সৈনিক মার্টিন গার্ডনার প্রয়াত হলেন। তথ্য প্রযুক্তির যুগে যেখানে তথ্য বিপ্লব দারুণভাবে দৃশ্যমান, সেখানে এই মানুষটির নিঃশব্দ প্রস্থান প্রমাণ করে যে বিশ্বসমাজ বা বিশ্বায়িত গ্রাম এখন বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করার থেকে কত শত যোজনই না দূর অবস্থান করছে।

১৯১৪ সালের ২১ শে অক্টোবর ওকলাহোমা-র তুলা অঞ্চলে গার্ডনার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একটি পরিবারিক খনিজ তেল সংস্থার ভূবিজ্ঞানী। শৈশবে গার্ডনার তাঁর মার কাছ থেকে মুখে মুখে গল্প শুনে (তাঁর মা তাঁকে বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতেন) পড়তে শিখে যান। কিছু দিন বাবার সংস্থায় চাকরি করার পর তিনি আবার পড়াশুনার জগতে ফিরে আসেন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। কিশোর বয়সে তাঁর উৎসাহের বিষয় ছিলো ইন্দ্রজাল, বিজ্ঞান, দাবা খেলা এবং বিজ্ঞানের নানান ধাঁধা সংগ্রহ করা।

সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত কলাম অমর-অক্ষয় হয়ে আছে। অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনি সমাজে বিজ্ঞান মনস্কতা জন্ম দেওয়ার বিষয়ে নিরলস কাজ করে গেছে। সায়েন্টিফিক অ্যামেরিকান পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত কলাম থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর তিনি "স্কেপটিক্যাল ইনকোয়ারার" পত্রিকায় অপবিজ্ঞান-বিরোধী একটি কলাম চালানো শুরু করেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "ফ্যাডস্ এন্ড ফ্যালাসিস ইন দি নেম অফ সায়েন্স" অনেকদিন ধরেই অপবিজ্ঞান-বিরোধী লড়াই এবং শাণিত হাতিয়ার ছিলো। তিনি আরও অনেকের সঙ্গে "কমিটি ফর দ্য সাইন্টিফিক ইনভেসটিগেসান অফ ক্লেমস অফ দ্য প্যারানরম্যাল" নামক সংস্থা গঠন করে নানান অবৈজ্ঞানিক দাবি অপ্রমাণ করার লড়াই-এ সামিল হন।

বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী স্টেফন জে গুল্ড, ১৯৮২ সালে গার্ডনার কে বর্ণনা করার সময় বলেছিলেন : "তিনি হলেন অনন্য দেদীপ্যমান আলোক বর্তিকা যা যুক্তি-বুদ্ধির পথকে উজ্জ্বল আলোর রশ্মি দিয়ে উদ্ভাসিত করেছে। তাঁর দেখানো পথ মায়াবাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ যুদ্ধকে শাণিত করেছে। যে যুক্তিহীন, অপবৈজ্ঞানিক কপট বুদ্ধিচর্চা আজকে আমাদের চারপাশ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টায় রত, [গার্ডনার] তার বিরুদ্ধে এক দৃঢ় প্রতিবাদ।" এই কথাগুলো আজও গার্ডনারের জন্য সমান ভাবেই প্রযোজ্য। - শু.মু.

অপূর্ব মুখোপাধ্যায় স্মরণে

(জন্ম : ২২ মে ১৯৫৪, মৃত্যু : ৭ অগাস্ট ২০১০)

অপূর্ব মুখোপাধ্যায় (অপু) আর নেই। ইস্ট ক্যালকাটা সোসিও-কালচারাল অর্গানাইজেশনের (ECSCO) সেই প্রাণচঞ্চল হাস্যময় এবং কাজ পাগল ছেলেটি মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ক্যানসারের শিকার হয়ে গেল। 'এবং ছাত্রছাত্রী' রাও হল কান্ডারীবিহীন। তার এই অকালমৃত্যুতে শোকাসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও সহযোদ্ধাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করব না; তবে অপু তার কাজের প্রেরণা যে কিছু তরুণে সঞ্চারিত করতে পেরেছে তা টের পাচ্ছি। এই সময়ে সেটা একটা বড় প্রাপ্তি। -সঃ মঃ